Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

দেওয়ান ফজলে আয়াজ

রোলঃ 216010878

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

দেওয়ান ফজলে আয়াজ

রোলঃ 216010878

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়ান ফজলে আয়াজ, আইডিঃ 216010878 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

দوان فضل عياض

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

(স্বাক্ষর)

দেওয়ান ফজলে আয়াজ

আইডিঃ ২১৬০১০৮৭৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

قوله تعالى : (ألا له الخلق والأمر)

قدمَ [عديٌّ بنُ حاتمٍ] على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو نصرانيٌّ فسمعه يقرأُ هذه الآيةَ : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ قال : فقلتُ له : إنَّا لسنا نعبدُهم ، قال : أليسَ يحرمونَ ما أحلَّ اللهُ فتحرِّمونَه ، ويحلُّونَ ما حرَّمَ اللهُ فتحلُّونَه ، قال : قلتُ : بلى ، قال : فتلك عبادتُهم

সূচিপত্র

গণতন্ত্র কী?

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Democracy। এটি Demos ও Kratos দু'টি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রিক শব্দ 'Demos' অর্থ হলো জনগণ 'Kratos' অর্থ হলো শাসন বা কর্তৃত্ব। সুতরাং Democracy-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো জনগণের শাসন বা কর্তৃত্ব।

সংজ্ঞা-১ঃ

Democracy: Free and equal representation of people.

A government in which the **supreme power** is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving periodically held free **elections**.

Democratic System of Government: A system of government based on majority decision-making.

সংজ্ঞা-২ঃ

গণতন্ত্রের সবার্ধিক জনপ্রিয় সংজ্ঞা সমূহের মাঝে অন্যতম হলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের সংজ্ঞা। তার মতে-

> Democracy is a Government of the people, by the people, and for the people.
>
> **অর্থঃ** "গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার।"

উপরোক্ত ২টি সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ সামনে আসে:

জনগণ কর্তৃক আইন প্রণয়নঃ

এখন প্রশ্ন আসে– সরকার যে জনগণের জন্য কাজ করবে এটা কীভাবে নিশ্চিত হবো? তা এভাবে যে, জনগণই নির্ধারণ করে দিবে সরকার কী আইন দিয়ে শাসন করবে। তাহলে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা যাবে। তাহলে এখানে আইন প্রণয়ন করবে জনগণ ।

ব্যক্তি স্বাধীনতাঃ

এককথায় জনগণের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাই এখানে সবকিছু । জনগণের পক্ষ হতে এই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটান জনপ্রতিনিধিরা। যদিও আমরা ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে দেখতে পাবো, এটাও একটা ডাহা মিথ্যা কথা। এটা কেবল একটা আকিদাগত দিক, যার উপর বাস্তবে আমল হয় না বললেই চলে। ধূর্ত শাসকগোষ্ঠী এর মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে থাকে।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনঃ

এখন প্রশ্ন হলো– নির্বাচনের পর সরকার যদি জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাকে কীভাবে অপসারণ করা হবে? এক্ষেত্রে বৈধ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হলো আবার নির্বাচন হবে।

অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যাতে দেখা যায় যে, জনগণের মতামতে কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা।

রাজনৈতিক দলঃ

ভোটের মাধ্যমে জনগণ জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে । এখানে আরেকটি প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত, তা হলো– জনগণ কাকে ভোট দিবে? এর উত্তর হলো– দেশের মধ্য জনগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করবে । এসব রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন নেতা থাকবে, জনগণ তাদেরকেই ভোট দিবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়ঃ

এখন সবাই তো আর একজনকে বা এক দলকেই ভোট দিবে না । তাহলে কে বা কোন দল সরকার গঠন করবে? এর উত্তর হলো– সংখ্যাগরিষ্ঠ যেদিকে ভোট দিবে সে বা তার দলই সরকার গঠন করবে ।

গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় সমূহঃ

তাহলে উপরোক্ত সংজ্ঞা সমূহ হতে এখন পর্যন্ত আমরা গণতন্ত্রের যে মৌলিক বিষয় বা উপাদান সমূহ পেলাম, তা হলো–

১. জনগণের সার্বভৌমত্ব

২. জনপ্রতিনিধি

৩. রাজনৈতিক দল

৪. একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন ও ভোট প্রদান

৫. সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়

৬. জনগণ কর্তৃক আইন প্রণয়ন

৭. ব্যক্তি স্বাধীনতা

৮. সকলের মতামত সমান

এছাড়া ইতিহাস থেকে আমরা আরো কয়েকটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবো, ইন শা আল্লাহ্। মোটাদাগে আমরা যদি গণতন্ত্রের এই সব মৌলিক বিষয় সমূহের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নিতে পারি, তাহলে আমরা গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, সেটাও সহজেই বুঝতে পারবো, ইন শা আল্লাহ্।

১. জনগণের সার্বভৌমত্ব

এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী একটা অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২. জনপ্রতিনিধি

এখানে আমরা জনপ্রতিনিধি কারা হবেন, ইসলাম বনাম গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি বা খলিফা হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ তুলনামূলকভাবে আলোচনা করবো, ইন শা আল্লাহ্। এজন্য আমরা আলোচনাটাকে ২ ভাগে করবো, ইন শা আল্লাহ্।

ক) ইসলামে খলিফা/রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য শর্তসমূহঃ

খলিফা তথা ইমামুল মুসলিমিন হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি প্রয়োজন–

১) **মুসলিম হওয়া;** কেননা মুসলমানদের উপর কাফিরের ইমামত বৈধ নয়।

২) **বালেগ হওয়া**; যেখানে নাবালকের জন্য ইমামতে ছুগরা তথা নামাজের ইমামতি পর্যন্ত বৈধ নয়।

৩) বুদ্ধিমান হওয়া, সুতরাং পাগলের ইমামত বৈধ নয়।

৪) **স্বাধীন হওয়া**; কেননা গোলাম যার নিজের উপর নিজের কোন অভিভাবকত্ব নেই, তাহলে সে অন্যের উপর কীভাবে অভিভাবকত্ব করবে?

৫) **শরিয়তের জ্ঞান**; যে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ তার অভিভাবকত্ব বৈধ নয়।

৬) **ন্যায়পরায়ণতা**; সুতরাং ফাসেক ব্যক্তির ইমামত সঠিক হবে না।

৭) **পুরুষ হওয়া**; সুতরাং কোন মহিলার ইমামত বৈধ নয়। কেননা মহিলারা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল এবং তাদের দ্বীন ও আকল অসম্পূর্ণ।

৮) উম্মাহর প্রয়োজনে বিভিন্ন ফায়সালায় **বিচক্ষণ মতামত** প্রদানের যোগ্যতা।

৯) **দৃঢ় চারিত্রিক গুণাবলী**, যেমন- সাহস ও বাহাদুরি, ন্যায়বিচার, হারামে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

১০) **দৈহিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা**; আর তা হলো শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সমূহের সুস্থতা ও যথার্থতা। কেননা এসবের অনুপস্থিতি ব্যক্তির মতামত এবং কাজকে প্রভাবিত করে।

১১) **ইমামতের প্রতি লোভ না থাকা**; কেননা যে এটি চায় অথবা এর প্রতি লোভ করে তাকে ইমামত দেওয়া হয় না।

১২) **কুরাইশ বংশের হওয়া**; কারণ কুরাইশরা আরব গোত্রের মধ্যে সর্বোত্তম, এবং ইমামতি তাদের মধ্যে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠরা তার অনুসরণ করে। জনগণ সন্তুষ্টির সাথে তার আনুগত্য করে এবং তার মাধ্যমে ঐক্য অর্জিত হয় এবং বিভক্তি দূর হয়।

তবে একান্ত কুরাইশ বংশের যোগ্য কাউকে না পাওয়া গেলে অন্য কেউও খলিফা হতে পারবে।

মুতাগাল্লিব তথা কেউ যদি আধিপত্যের মাধ্যমে ইমামতি করে এবং বিবাদের আশংকা থাকে, তাহলে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ না করলে তার আনুগত্য করাও ওয়াজিব।

এবার আপনারাই ফায়সালা করুন, গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য কি এই শর্তগুলো প্রয়োজন ? গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য কি মুসলিম হওয়া আবশ্যক কিংবা শরিয়তের জ্ঞান থাকা আবশ্যক ? অথচ এগুলোর মাঝে বেশির ভাগই এমন শর্ত, যা ছাড়া ইমামতে ছুগরা তথা নামাযের ইমামতও শুদ্ধ হয় না।

এখন কেউ হয়ত বলতে চাইবেন, আমরা ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলছি যেখানে আমরা উপরোক্ত বিষয় সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করবো। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিবো, আল্লাহর আইন দিয়ে দেশ চালাবো। কিন্তু গণতন্ত্রকে আমরা শুধুমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। তাদের জন্য আমার উত্তর হলো–

প্রথমত, গণতন্ত্র একটি পরিভাষা। তাই এর অর্থ তাদের থেকেই নিতে হবে, যারা এটি আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং তারা যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটাই ধর্তব্য হবে, আপনাদেরটা নয়।

দ্বিতীয়ত, যদি গণতন্ত্র থেকে সবকিছু ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে তাকে আর গণতন্ত্র বলারই বা কী দরকার ! কারণ গণতন্ত্রের আলাদা একটা পারিভাষিক অর্থ আছে ।

তৃতীয়ত, নির্বাচনের মাধ্যমে মাধ্যমে ক্ষমতায় যেয়ে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন, তাদের এই স্বপ্ন দিবাস্বপ্ন । তারা মূলত এই জাতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র ও আমলাতন্ত্র বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন । তাছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে এভাবে কি কোথাও ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে ? মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমিন গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় গেলেও তারা তেমন কোন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে পারেনি । উপরুন্ত অল্প কিছু সময়ের ব্যবধানে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদের পতন ঘটে এবং সামরিক শাসক সিসি ক্ষমতায় আসে । তাই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে । একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হওয়া যাবে না । রাসূল ﷺ বলেন–

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

অর্থঃ মু'মিন একই গর্ত হতে ২ বার দংশিত হয় না । – (বুখারী ও মুসলিম)

চতুর্থত, তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, আপনারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে আপনাদের দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন, তারপরেই কি শেষ ?! আপনাদের তো পুরো দুনিয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে? অন্য দেশে কীভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন ?! তার মানে, এখানে আর গণতন্ত্র কাজ করছে না । এজন্য গণতন্ত্রের সাথে জাতীয়তাবাদ ও দেশ প্রতিমার পূজা অনিবার্যভাবে চলে আসে ।

পঞ্চমত, আপনারা হয়ত ভেবেছেন, প্রথমে সহজ কোন উপায়ে মদীনার মত একটা রাষ্ট্র বানাবো । তারপর সেখানে থেকে পুরো বিশ্বে জিহাদ পরিচালনা করবো । সেই সহজ উপায়টি কী, যা দিয়ে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ? সেটা কি গণতন্ত্র ? নিশ্চয়ই না । যে অবস্থা বা পরিস্থিতি মদিনাকে ইসলামের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো তা হলো ফিজার যুদ্ধ, যার ফলে মদীনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়েছিলো । তারা এই

নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে ইসলামের পথকে বেছে নিয়েছিলো ।

ষষ্ঠত, যারা আবু বকর রাঃ এর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি দিয়ে ভোটাভুটির পক্ষে দলিল দেন, তারা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, দেশে বর্তমানে ইসলামী হুকুমত চলছে । কেননা যতদিন ইসলামী শাসন ছিলো না, ততদিন সাহাবা রাঃ রাসূল ﷺ এর অধীনে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, যাদের কোন ভূমি কিংবা কর্তৃত্ব ছিলো না । এরপর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র হলো, আর সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-ই হলেন, যিনি পূর্ব থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছিলেন । রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর প্রায় সকল বিশিষ্ট সাহাবীদের ঐকমতের ভিত্তিতে আবু বকর রাঃ খলিফা হন । সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাশোয়ারার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রে ক্ষমতার পালাবদল হয়ে থাকে । কিন্তু কুফরী ব্যবস্থা থেকে ইসলামী ব্যবস্থার নিকট ক্ষমতার পালাবদল কেবল মাশোয়ারার মাধ্যমে হতে পারে না । উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, মক্কা বিজয় মাশোয়ারার মাধ্যমে হয়নি।

খ) নারী নেতৃত্বঃ

আমরা যদি শরীয়তের উসূল ও মূলনীতির দিকে তাকাই, তাহলে এটার বৈধতা পাওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। **যেমন**, মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশ হল–

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ

অর্থঃ তোমরা তোমাদের নিজ গৃহে অবস্থান করবে।– (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৩৩)

মজলিসে শূরায় শরীক হওয়ার জন্য মহিলারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানী, জেলা শহর বা যেখানে মজলিসে শূরা বসবে সেখানে উপস্থিত হতে যাওয়া বিনা দরকারে এ আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ। অধিকন্তু ফিতনার আশঙ্কায় যেখানে মসজিদে যেতেও মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে দূর-দূরান্ত

থেকে পুরুষদের সাথে এসে এক মজলিসে শরীক হওয়ার অনুমতি কিভাবে হবে? বরং মহিলারা ঘরে থাকবে, ঘরেই প্রতিপালিত হবে- এটাই শরীয়তের কাম্য। বাহিরের কাজে অংশ নেয়া শরীয়তের কাম্য নয়।

মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হল–

اَوَ مَنۡ یُّنَشَّؤُا فِی الۡحِلۡیَۃِ وَ ہُوَ فِی الۡخِصَامِ غَیۡرُ مُبِیۡنٍ ﴿۱۸﴾

অর্থঃ যারা অলংকার মণ্ডিত হয়ে প্রতিপালিত হয় আর তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্য প্রদানে অসমর্থ্য।– (সূরা যুখরুফ, আয়াতঃ ১৮)

সাধারণত মহিলাদের শারীরিক শক্তি, স্বরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা সব কিছুই পুরুষের তুলনায় কম। পুরুষের তুলনায় তাদের দ্বীনও অপূর্ণাঙ্গ, বিবেক-বুদ্ধিও অপূর্ণাঙ্গ।

হাদিসে তাদেরকে বলা হয়েছে–

ناقصات عقلٍ ودين

অর্থঃ যাদের আকল ও দ্বীন উভয়ই অপূর্ণ।– (সহীহ বুখারী ৩০৪, সহীহ মুসলিম ২৫০)

এ কারণে শরীয়ত মহিলাদের একক সাক্ষ্য গ্রহণ করে না। সাথে পুরুষ থাকলেই কেবল গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয়। তখনও আবার দুই মহিলা মিলে এক পুরুষের সমান। অর্থাৎ এক মহিলা এক পুরুষের অর্ধেক।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

“তাদের আকল অপূর্ণ হওয়ার দলীল এই যে, দুই মহিলার সাক্ষ্য এক পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটি আকলের অপূর্ণতার কারণে। আর (হায়েযের দিনগুলোতে) তারা অনেক দিন পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করে যে, তাদের নামায পড়তে হয় না এবং রমযানের দিনে রোযাও রাখতে হয় না। এটিই তাদের দ্বীনের অপূর্ণতা।”– (সহীহ মুসলিম ২৫০)

সৃষ্টিগতভাবেই যারা দুর্বল এবং অপূর্ণাঙ্গ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও যারা অপূর্ণাঙ্গ, তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর স্পর্শকাতর বিষয়াশয়ে শরীক করা, তাদের থেকে পরামর্শ নেয়া, সে অনুযায়ী কাজ করা নিশ্চয়ই উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতা না হয়ে তাদের সাথে খিয়ানত হবে। পুরুষ তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়নি যে, তাদের বাদ দিয়ে অপূর্ণাঙ্গ মহিলাদেরকে মজলিসে শুরায় শরীক করতে হবে।

রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো, তারা কখনও মহিলাদেরকে পরামর্শের মজলিসে আরো দশ পুরুষের সামনে উপস্থিত করে পরামর্শ নিতেন না। আর নিয়মিত মহিলাদেরকে মজলিসে শূরার সদস্য বানানোর তো কোন প্রশ্নই আসে না।

উপরোক্ত মূলনীতিগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, মহিলাদেরকে মজলিসে শূরার সদস্য করে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়াশয়ে তাদের থেকে পরামর্শ নেয়া শরীয়তের নির্দেশও নয়, কাম্যও নয়, রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের ত্বরীকাও নয়। এটি সম্পূর্ণই একটি নব আবিষ্কৃত বিদআতি বিষয়। শরীয়তের উসূল-মূলনীতি ও মেজাজ পরিপন্থী একটি কাজ। আর ফিতনার আশঙ্কার কথা তো বলাই বাহুল্য।

এ গেল আম দলীল। আর যদি খাস দলীলের দিকে যাই, তাহলে দেখতে পাবো **হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাণী,**

كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئًا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله، رأينا لهن بذلك علينا حقًا، من غير أن ندخلهم في شيءٍ من أمورنا

"জাহিলি যামানায় আমরা মহিলাদের কোন পজিশন আছে বলেই মনে করতাম না। এরপর যখন ইসলাম আসল, আল্লাহ তাআলা মহিলাদের কথা আলোচনায় আনলেন, তখন মনে হল যে, আমাদের কাছে তাদের কিছু হক পাওনা আছে। **কিন্তু আমাদের (রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক) বিষয়াশয়ের কোনো কিছুতেই আমরা তাদেরকে শরীক করতে পারি না।**"– (সহীহ বুখারি ৫৮৪৩, কিতাবুল লিবাস)

এখানে কেউ হয়ত হুদায়বিয়াতে উম্মে সালাম রাঃ কর্তৃক রাসূল ﷺ-কে পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত হাদিস দিয়ে মহিলাদের শূরা সদস্য হওয়ার পরামর্শ দিতে চাইবেন।

উম্মে সালামা রাদি. এর হাদিসের ব্যাপারে মুফতি তাকি উসমানি সাহেব মন্তব্য করেছেন যে, মহিলাদের নিয়মতান্ত্রিক সদস্য বানানোর পক্ষে এ হাদিস দলীল হয় না। কারণ, ঘটনাবশত কোনো ক্ষেত্রে কোনো একটি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করার দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় না যে, তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক সদস্য বানানো যাবে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে কাজ করা যাবে।

এখানে বেশির চেয়ে বেশি যতটুকু আছে, স্বামী বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে মুনাসিব মনে করলে তার বুদ্ধিমতি স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে। মহিলারা যদিও নাকিসাতুল আকল তথা বুদ্ধি-জ্ঞান কম, তথাপি বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে যদি অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমতি কোনো মহিলা কোনো পরামর্শ দেয়, আর তা শরীয়ত ও বাস্তবতার আলোকে মেনে নেয়া মুনাসিব মনে হয়, তাহলে মেনে নেয়া যাবে।

রাসূল ﷺ ইরাশাদ করেন–

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

যে জাতি নিজেদের নেতৃত্ব কোনো মহিলার হাতে সোপর্দ করেছে, তারা কিছুতেই কামিয়াব হতে পারবে না।– (সহীহ বুখারি ৪১৬৩)

পরিশেষে বলতে চাই, **যেখানে ইমামতে সুগরাহ মহিলাদের জন্য জায়েজ নয়, সেখানে ইমামতে কুবরা কীভাবে জায়েজ হতে পারে** ! কিন্তু গণতন্ত্রে খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য নারী-পুরুষ কোন শর্ত নয় ।

৩. রাজনৈতিক দল

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করতে হয় । এখানে জাতিকে সরকারী ও বিরোধী দলে বিভক্ত করা হয় । সরকারী ও বিরোধী দলসমূহের মাঝে থাকে চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা । সরকারি দল বিরোধী

দলকে পরাস্ত করতে সদা তৎপর থাকে, যেমনটা আল্লাহ্ ﷻ ফির‘আউনের ব্যাপারে বলেন–

اِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِی الۡاَرۡضِ وَجَعَلَ اَهۡلَهَا شِیَعًا یَّسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَۃً مِّنۡهُمۡ یُذَبِّحُ اَبۡنَآءَهُمۡ وَ یَسۡتَحۡیٖ نِسَآءَهُمۡ ؕ اِنَّهٗ کَانَ مِنَ الۡمُفۡسِدِیۡنَ

অর্থঃ নিশ্চয় ফির‘আউন (মিশর) দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার অধিবাসীকে নানা দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একদলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত আর কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম।– (সূরা কাসাস, আয়াতঃ ০৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে বলা হয়–

> **ফির‘আউনের কাছে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকারও দেয়া হয়নি। বরং সে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীন করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে হেয় করে রেখেছিল।**

এভাবে গণতন্ত্রও জাতির মাঝে স্থায়ীভাবে দলাদলি ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করে। এই ধরনের বিরোধীতায় সত্য ও ন্যায়নীতি কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। এখানে প্রধান্য পায় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ। আর তা হবে না-ই বা কেন ?! গণতন্ত্রে তো আদর্শ ও নীতি নৈতিকতার কোন স্থান নেই। এটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ চাইলে আদর্শবান হতে পারে, আবার চাইলে এসবকে স্বার্থ ও কামনা-বাসনার বেদিতে বলিও দিতে পারে। তাকে শুধু এতটুকুই দেখলেই হচ্ছে, গণতান্ত্রিক আইনে তা নিষেধ কিনা। আর সেই আইনও পার্লামেন্টের ইচ্ছার কাছে অসহায়।

এটাও জানা কথা যে, পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই থাকে সরকারী দলের। আর এটাও অজানা নয় যে, পার্লামেন্টে পাস হওয়ার জন্য ঐ আইনের পক্ষে

সংসদের অধিকাংশ সদস্যের ভোট থাকতে হয়। এখন দেখুন, সংসদের অধিকাংশ সদস্য হলো সরকারী দলের। তাহলে কেমন জানি, সরকারী দলই আইনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সুতরাং তারা চাইলে তাদের যেকোন কর্মকে বৈধতা দিতে পারবে। কারণ এখানে তো ঈমান-আকীদা ও আমাল-আখলাকে সংসদ সদস্য কিংবা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়নি। সুতরাং এমন ব্যক্তিদের থেকে আপনি কীভাবে আশা করেন যে, তারা দলের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোট দিবে, বিশেষত ঐ আইনের ক্ষেত্রে যা সরকার বিরোধী দলকে দমন করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করতে চায়।

এখন কেউ হয়তো বলবে, বিরোধী দল তো আছেই তাদের এই ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করার জন্য। আমরা দেখেছি, সরকার এই সমস্ত বিরোধিতা ও আন্দোলনকে কত কঠোর ও নির্মমভাবে দমন করে! যখন সরকার এত কিছু করছে, তখনও কিন্তু তারা বৈধ কাজ করছে, যেহেতু আইনটি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাস হয়েছে!

এভাবে জাতির এই বিভাজন যেমন রক্তক্ষয়ী হয়, তেমনি জাতিকে ঠেলে দেয় এক দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে। জাতি তখন বহিঃশত্রুর মোকাবিলার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজেদের মাঝেই মারামারিতে ব্যস্ত থাকে। আর শত্রুরা এটাই চায়।

এজন্য ইসলামে সব ধরনের দলাদলি নিষিদ্ধ এবং রাসূল ﷺ এ ধরনের দলাদলিকে জাহেলিয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নিচে উদাহরণ হিসেবে আমরা সীরাত থেকে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি–

ঘটনা–১ঃ

বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পর রাসূল ﷺ তখনও মোরায়সী ঝর্নার নিকটে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় কিছু লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে আসে। আগমনকারীদের মধ্যে হযরত উমার রাঃ এর একজন শ্রমিকও ছিল। তার নাম ছিল যাহাজা গিফারী। আর একজন ছিল যার নাম ছিল সিনান ইবনে ওয়াবার জুহানী। কোন কারণে দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সূচনা হয়ে শেষ পর্যন্ত ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জুহানী চিৎকার শুরু করে দেয়, "**আনসারদের দল! সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এসো**"। অপরপক্ষে জাহাজাও

আহবান করতে থাকে, "**মুহাজিরদের দল! আমাকে সাহায্য করার জন্য শীঘ্রই এগিয়ে এসো**"। রাসূল ﷺ এ সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন এবং বললেন, "**আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছি, অথচ তোমরা জাহেলী যুগের মতো আচরণ করছো? তোমরা এটা ছেড়ে দাও, এসব হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।**"

<u>ঘটনা–২০ঃ</u>

মদিনায় শাস ইবনে কায়েস নামের এক বুড়ো ইহুদি ছিল। সে ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী এবং মুসলিমদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাপরায়ণ। সে একদিন আউস এবং খাযরাজের সাহাবীদেরকে একটি মজলিসে মিলেমিশে গল্প করতে দেখল। এই দৃশ্য দেখে তার মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। সে এক ইহুদি যুবককে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠালো যে, সে যেন তাদের কাছে যায় এবং তাদেরকে জাহেলি যুগের বুআস যুদ্ধ, হানাহানি ও শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে উস্কানি দেয়। যুবকটি তার কথামতো কাজ করল এবং সেই বুড়ো ইহুদীর পরিকল্পনায় সফল হওয়ার উপক্রম হল। অল্প সময়ের মাঝেই আউস এবং খাযরাজের সাহাবীদের মাঝে পুরনো গোত্রীয় চেতনা এবং শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কথায় কথায় যুদ্ধ পর্যন্ত শুরু হওয়ার উপক্রম হল।

আউস এবং খাযরাজের মাঝে যুদ্ধের কথা রাসূল ﷺ-এর কানে পৌঁছলে তিনি ছুটে এলেন। এবং মুসলিমদের বললেন, "**তোমরা তল্লাহকে ভয় করো। তোমরা কি আবার সেই জাহেলিয়াতে জীবনে ফেলে আসা শত্রুতাকে ফিরিয়ে আনতে চাও? অথচ আমি এখনো তোমাদের মাঝে আছি। আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমান-ইসলামের দিকে হেদায়েত করেছেন। তোমরা কি আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা ভুলে গেছ, যে অনুগহের কারণে আজ তোমরা জাহেলিয়াত ও কুফরি থেকে মুক্তি পেয়েছ? যে অনুগ্রহ তোমাদের অন্তরে শত্রুতার পরিবর্তে ভালোবাসার ও বন্ধুত্বের বীজ বপন করেছে?**"

রাসূল ﷺ -এর এই কথা শুনে সাহাবীরা সম্বিত ফিরে পেলেন। তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করতে শুরু করলেন এবং পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

وَ اعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِیۡعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوۡا ۪ وَ اذۡکُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَیۡکُمۡ اِذۡ کُنۡتُمۡ اَعۡدَآءً فَاَلَّفَ بَیۡنَ قُلُوۡبِکُمۡ فَاَصۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِهٖۤ اِخۡوَانًا ۚ وَ کُنۡتُمۡ عَلٰی شَفَا حُفۡرَۃٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنۡقَذَکُمۡ مِّنۡهَا ؕ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمۡ اٰیٰتِهٖ لَعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ﴿۱۰۳﴾

অর্থঃ আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।– (সূরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১০৩)

উপরোক্ত দুটি ঘটনা থেকে আমরা দেখলাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ জাতীয়তাবাদ ও দলাদলিকে কুফরী, জাহেলিয়্যাত ও দুর্গন্ধযুক্ত আচরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর গণতন্ত্রে দলাদলি হলো অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এসব ছাড়া গণতন্ত্র চলে না। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহে দলাদলির ভিত্তিতে মারামারি-হানাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ও ডাল-ভাত। সুতরাং আপনারাই অনুমান করুন, গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী হবে!

গণতন্ত্রের বিপরীতে ইসলামী খিলাফা ব্যবস্থায় জাতিকে সরকারি ও বিরোধী দলে বিভক্ত করার কোন সুরত নেই। ইসলামি রাষ্ট্রে সরকারের কর্মকাণ্ডের যথার্থ ও গঠনমূলক সমালোচনা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং একটি দ্বীনি দায়িত্ব। কিন্তু বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা কিংবা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে বিরোধিতার কোনো সুযোগ এখানে নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে মজলিসে শূরা একটি একদলীয় সভা। এটি ইসলামি বিধানে পারদর্শী রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি দিক থেকে দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয়। শূরা সদস্যগণ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী, শরীয়তের সীমারেখায় থেকে আপন মতামতের ব্যাপারে স্বাধীন, সত্য প্রকাশে অকুতোভয় এবং দ্বীনের সাহায্যে পাহাড়ের ন্যায় অটল।

এখানে অনেকে হয়ত ফিকহী মাজহাব সমূহের মাধ্যমে দলাদলির পক্ষে দলীল দিতে চাইবেন। যাদের '**এখতিলাফ ও ইফতিরাক**' সম্পর্কে নুন্যতম ধারনা আছে, আশা করি, এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ কিংবা যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদেরকে বুঝানোর কিছু নেই। আর গণতন্ত্রের যেসব দলাদলি, তা যে এখতিলাফের পর্যায়ে পড়ে না– সেটা বুঝতে বড় কোন ফকীহ বা আলিম হওয়ার দরকার নেই। কেবল চোখ আর কান দু'টো খোলা রাখলেই চলে।

৪. একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন ও ভোট প্রদান

খুলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে আমরা দেখে এসেছি যে, যখন-ই কেউ খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি তাঁর জীবনের শেষ অবধি খলিফা পদে বহাল থেকেছেন। উনার জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার খলিফার ব্যাপারে উম্মাহর নেতৃবর্গের মতামত যাচাই করা হয়নি। শুধুমাত্র আলী রাঃ এর ক্ষেত্রে এতটুকু হয়েছে যে, মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে দ্বন্দ্বের জেরে তাকে আবার খলিফা নির্বাচনের প্রস্তাব করা হলে তিনি তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেন। আর এই এক্ষেত্রে উনার অবস্থানই সঠিক ছিলো।

যাইহোক, এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, খলিফার বিরুদ্ধে তার অপসারণের জন্য কোন বিদ্রোহ জায়েজ নয়, যতক্ষণ না তার থেকে সুস্পষ্ট কুফরী প্রকাশ পায়।

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বায়’আত করেছিলাম যে, আমরা শুনব ও আনুগত্য করব; যদিও তা কষ্টে, আরামে, সুখে ও দুঃখে হয়। আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিলে আমরা ধৈর্যধারণ করব। আমরা ক্ষমতাশীল ব্যক্তির বিরোধিতা করব না। আমরা হকের উপর থাকব,

যেখানেই থাকি না কেন। আল্লাহর পথে আমরা কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে মোটেও পরোয়া করব না।

অপর এক বর্ণনাতে আছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের থেকে বায়'আত নিলেন যে, আমরা ক্ষমতাশীল শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করব না। তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারো, যদি তাকে প্রকাশ্য কুফরীতে নিমজ্জিত হতে দেখো। আর সে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর কুরআন (ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস)-এর ভিত্তিতে কোনো দলীল প্রমাণ বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু আমরা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। উনার জীবদ্দশাতেই কিছুদিন পরপর আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই নিয়মটিও খিলাফা ব্যবস্থার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ খিলাফার বিষয়টি কোন খেলতামাশার বিষয় না। অনেক সময় সরকার পরিবর্তন জাতিকে অভ্যন্তরীণ বিভাজন, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিকে ঠেলে দেয়। তাই খুলাফায়ে রাশেদার মধ্য থেকে আবু বকর রাঃ উনার ওফাতের পূর্বেই প্রবীণ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী খলিফা হিসেবে ওমর রাঃ এর নাম ঘোষণা করে যান।

যখনই পরবর্তী খলিফা নির্বাচন নিয়ে ফিতনার কোন আশংকা তৈরী হয়েছে, তখনই খলিফাগণ পরবর্তী খলিফার নাম ঘোষণা করে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। মুয়াবিয়া রাঃ আপন পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা ঘোষণার করার পিছনে এটাও একটা বড় কারণ হিসেবে মনে করা হয়।

তাই রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য খলিফার স্থিশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিষয়টিকে কেবল জনগণের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। এমনকি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার স্বার্থে ইসলামে শর্ত স্বাপেক্ষে মুতাঘাল্লিব শাসকের পর্যন্ত আনুগত্য করতে বলা হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে খিলাফা ব্যবস্থাকে কারো নিকট একনায়কতন্ত্র সদৃশ মনে হতে পারে। বাস্তবতা হচ্ছে, একনায়কতন্ত্রের সাথে ইসলামের রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

একনায়কতন্ত্রে রাজা/রাষ্ট্র প্রধানের কথা-ই আইন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে সরানোর অধিকার কারো নেই। তিনি যা-ই করেন, তা-ই সঠিক।

কিন্তু খিলাফার ক্ষেত্রে এসবের কিছুই নেই। এখানে আইন প্রণয়নের অধিকার কেবল আল্লাহর। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। শাসক কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি মাত্র। হারাম ও ধ্বংসাত্মক বিষয়ে শাসকের কোনো আনুগত্য আবশ্যক নয়।

শাসক থেকে স্পষ্ট কুফুরী প্রকাশ পেলে তাকে অপসারণ কেবল বৈধই নয়, বরং সামর্থবান সকলের উপর ওয়াজিবও বটে। তাই একনায়কতন্ত্র বা গণতন্ত্রের সাথে খিলফার তুলনা চলে না।

এখন কেউ হয়তো ভাবতে পারে, তাহলে খিলাফা ব্যবস্থা হয়ত পোপতন্ত্রের মতোই কোন কিছু । এটাও পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ পোপেরা আল্লাহর আইন পরিবর্তন করেছে এবং নিজেদের রচিত আইনকে আল্লাহর বিধান বলে চালিয়ে দিত। তারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করতো না। এছাড়া তাওরাত-ইঞ্জিল তো বিকৃত হয়ে গিয়েছে । আল্লাহ্ ﷻ এসবের হিফাজতের দায়িত্বও নেননি, কারণ এরপরেও নবুয়্যতের ধারা অব্যাহত ছিলো ।

অথচ কুরআনের হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ ﷻ, যেহেতু রাসূল ﷺ হলেন খাতামুল আম্বিয়া । আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ ﴿۹﴾

অর্থঃ নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।

এছাড়া আল্লাহ রাসূল ﷺ বলেন–

لو أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

অর্থঃ মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

অতএব, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা পোপতন্ত্র- এদের কোনটির সাথে খিলাফা ব্যবস্থার তুলনা চলে না ।

যেখানে খলিফাগণ ফিতনার আশংকা থাকলে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি সাধারনের ইচ্ছার উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেরাই ঠিক করে যেতেন যে, পরবর্তী খলিফা কে হবে, সেখানে গণতন্ত্রে কোন কারণ ছাড়াই নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্বাচন হচ্ছে । সুতরাং নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্বাচন হওয়ার দিক থেকেও ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের বৈপরীত্য সুস্পষ্ট।

৫. সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়

আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

وَ اِنۡ تُطِعۡ اَکۡثَرَ مَنۡ فِی الۡاَرۡضِ یُضِلُّوۡکَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ؕ اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنۡ ہُمۡ اِلَّا یَخۡرُصُوۡنَ ﴿۱۱۶﴾

অর্থঃ আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।– (সূরাঃ আন'আম, আয়াতঃ ১১৬)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, সংখ্যাধিক্যতা কোন অবস্থাতেই সঠিক হওয়ার দলীল নয়। কারণ হক বা সঠিক পথ দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যালঘুতার ভিত্তিতে নয়। সাধারণত, হকপন্থীরা সংখ্যায় কম থাকে, কিন্তু তারা আল্লাহর নিকট প্রতিদানের দিক থেকে অধিক অগ্রগামী ।–(তাফসীরে সা’দী)

অন্যত্র আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা বলেন–

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়।– (সূরাঃ ইউসুফ, আয়াতঃ ১০৩)

রাসূল ﷺ যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এলেন তখন বেশির ভাগ মানুষই শিরকের উপর ছিলো। যদি তখন ইসলাম ও শিরকের মাঝে ভোটাভুটি হতো, তাহলে শিরকই বিজয় হতো; আর ইসলামের দাওয়াত মুখ থুবড়ে পড়তো।

তাই ইসলামে সত্য ও মিথ্যা নিরূপণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা একমাত্র মানদণ্ড নয়। আমরা অনেকে হয়ত ভাবতে পারি, আল্লাহর রাসূল ﷺ তো বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবীদের মতামত নিয়েছেন। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন প্রশ্নই না থাকে, তাহলে উনি মতামত নিতে গেলেন কেন!

মাশোয়ারার অনেক ফযিলত আছে যা এখানে আলোচনার বিষয় নয়। তারপরও একটু করে বলছি, মাশোয়ারার মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কোন বিষয়ে কাউকে এককভাবে দোষারোপের সম্ভবনা দূর হয়। কোন একটা রায়ের ভুলগুলো ধরা পড়ে। এর মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরী হয়। সাথীরা চিন্তা করতে শিখে।

যাইহোক, মূল বিষয়ে আসি, রাসূল ﷺ বিভিন্ন ফযীলতের কারণে সাহাবীদের সাথে মাশোয়ারা করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ ﷻ উনাকে মাশোয়ারা করতে বলেছেন। আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

অর্থঃ অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। **আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর**। অতঃপর

যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।

এখানে কি কোথাও বলা হয়েছে যে, আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিন। না, বলা হয়নি। আমরা রাসূল ﷺ -এর জীবনী থেকেও দেখতে পাই যে, তিনি কখনো সবার সিদ্ধান্তের বিপরীতে গিয়ে কাজ করেছেন। যেমনটা হয়েছে হুদায়বিয়াতে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় শায়খাইন অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রধান্য দান করেছেন। এমন কি এমন ধারণাও হতে লাগল যে, উল্লেখিত আয়াতটি এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্যই নাযিল হয়ে থাকবে। **মোটকথা সর্বাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্টের মতই গ্রহণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। বরং এখানে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার কাছাকাছি যা হবে তা-ই হবে গ্রহণযোগ্য।**

যাইহোক, এখন কেউ বলতে পারে উনার উপরে তো ওহী হতো। তাহলে আমরা মানলাম, ওহীর উপর কোন মাশোয়ারা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা চলে না। কিন্তু গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ই মুখ্য। এর বিপরীতে ওহীরও কোন মূল্য নেই।

এছাড়াও আমরা দেখেছি, আবু বকর রাঃ সবার মতামতের বিপরীতে গিয়ে উসামা রাঃ এর বাহিনীকে জিহাদে পাঠিয়েছেন। পরে সবাই উনার সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং উপলব্ধি করেন যে, সিদ্দিকে আকবর রাঃ এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিলো।

এছাড়াও যাকাত অস্বীকাকারীদের বিরুদ্ধে তিনি আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সুতরাং আমরা দেখলাম যে, ইসলামে আমীর সবার মতের বিপরীতে গিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন এবং সবাই তার আদেশ মানতে বাধ্য, যতক্ষণ না তিনি কোন হারাম কাজের নির্দেশ করেন।

সুতরাং ইসলামে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে আমরা বড়জোর মুবাহ বলতে পারি। কিন্তু গণতন্ত্রে তা ফরজ সমতুল্য। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপরই ফয়সালা হবে।

আমরা যদি পূর্ববর্তী নবীদের ইতিহাসও দেখি তাহলেও দেখতে পাবো, তাদেরকে যারা মান্য করেছে তাদের সংখ্যা সব সময় অল্প ছিলো। নূহ আঃ এর সাড়ে নয় শ' বছরের দাওয়াতে মাত্র ৮০ জন লোক ঈমান এনেছিলো। হাদিসে তো এমনও এসেছে যে, কিয়ামতের মাঠে কোন কোন নবীর কোন অনুসারীই থাকবে না।

এরপর আসি জান্নাতি ও জাহান্নামীদের বিষয়ে। এখানেও দেখবেন, জাহান্নামীদের সংখ্যাই বেশি। আর হাদিস তো আমাদের অনেকরই জানা। রাসূল ﷺ বলেন–

প্রত্যেক একশ'র মধ্যে ৯৯ জন জাহান্নামে যাবে।– (বুখারী)

এবার আসি, পুরো দুনিয়াতে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, নাকি কাফেরদের সংখ্যা বেশি ?

মুফতি নিজাম উদ্দিন শামযায়ী শহিদ রহঃ বলেন–

"পৃথিবীতে আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন ভোটের মাধ্যমে কিংবা পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ী হবে না। কারণ পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দুশমনদের সংখ্যাই বেশি। ফাসেক ফাজদেরদের সংখ্যাই বেশি। আর গণতন্ত্রের হল মানুষের মাথার সংখ্যার নাম, মানুষের ব্যক্তিত্বের ওজনের নাম নয়।"

এবার এই মুসলমানদের মধ্যে আলিমের সংখ্যা বেশি, নাকি জাহেলদের সংখ্যা বেশি? কিন্তু গণতন্ত্র মানলে আমাদেরকে আলিমদের নয়, জাহেলদেরকেই অনুসরণ করতে হবে।

এখানে কেউ হয়ত এই হাদিস দিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে দলীল দিতে চাইবেন–

روى الترمذي (2167) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ). وحسنه الألباني.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা আমার উম্মতকে পথভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না, আর আল্লাহর সাহায্য জামাতের সাথে ।

কেউ হয়ত বলতে চাইবেন, এখানে তো অধিকাংশের মতকে সঠিক বলা হচ্ছে । চলুন, আমরা দেখি, এই হাদিসে জামাত দ্বারা কাদেরকে বুঝিয়েছে ।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন–

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه : " وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ

অর্থঃ আহলুল ইলম তথা আলিমদের নিকট এখানে জামাত (সংখ্যাগরিষ্ঠতা) দ্বারা উদ্দেশ্য ফকীহ, আলিম ও মুহাদ্দিসগণ ।

উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহঃ বলেন–

قال الملا علي القاري : " الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ، ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم ". انتهى "مرقاة المفاتيح" (2 / 61)

অর্থঃ হাদিসটি মুসলিমদের ইজমা সঠিক হওয়ার দলীল । আর এখানে উদ্দেশ্য হলো আলিমদের ইজমা । আর সাধারনের ইজমা ধর্তব্য নয়, কেননা ইলম ব্যতিত ইজমা হতে পারে না ।

সুতরাং আমরা দেখলাম, এই হাদিস দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার পক্ষে দলিল দেওয়া সঠিক নয় । কারণ গণতন্ত্রে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বলা হয়, তাতে আলিম-আওয়াম সবার মতামত সমান ।

আর এখানে যেসব হাদিস উল্লেখ করলাম, এগুলো ইজমা ও জামাত নিয়ে । ইজমা হলো শরিয়তের ৩য় উৎস । গণতন্ত্রে ইজমা তো পরের কথা, কুরআন-হাদিসেরও কোন মূল্য নেই । বাকী থাকলো জামাত । যদি ধরেও নিই যে, কোন একটা গনত্রান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবাই একটি ইসলামিক দলের সাথে আছে, আর কোন দল নেই তাহলেও তো সেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হচ্ছে না । কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য । সুতরাং গণতন্ত্রে

জামাতেরও অস্তিত্ব নেই। বরং দলাদলি হলো গণতন্ত্রে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। আর এই বিষয়ে আমরা স্বস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

অতএব আমরা দেখলাম, সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়েও ইসলাম গণতন্ত্রের সাথে একমত নয়। তবে কোথাও কোথাও ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সীমিত পরিসরে বিবেচনায় নিয়ে থাকে, যা আমরা "**হাকিম বনাম হুকুম**" শিরোনামের অধীনে আলাদা পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

৬. জনগণ কর্তৃক আইন প্রণয়ন

আমরা এই বিষয়টি "**শরীয়তের বিপরীতে আইন প্রণয়নকারী নিজেকে মিথ্যা ইলাহ ও মা'বুদে পরিণত করে**" ও "**গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করার বিধান**" শিরোনামের অধীনে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

৭. ব্যক্তি স্বাধীনতা

আমাদের এসব দেশ থেকে যারা পশ্চিমে যায়, তাদের থেকে ঐসব দেশের ব্যাপারে যে প্রশংসাটি সবচেয়ে বেশি শোনা যায় তা হলো– ঐসব দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে। কেউ কেউ তো ঐসব দেশে যাওয়াকে আবিসিনিয়ায় হিজরত বলতেও দ্বিধা করেন না। একথা সত্য যে, কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দেশ সমূহ থেকে ঐসব দেশে কিছুটা হলেও বেশি সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, তারা হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে। হিজাব পরে বের হলে তাদেরকে জেলে নিচ্ছে; জরিমানা করছে। এছাড়া অন্যান্য বিষয় তো আছেই। কেউ ইসলামের বিরোধিতা করে সেসব দেশে যেতে চাইলে তাদেরকে সে দেশের প্রেসিডেন্ট এসে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে নিয়ে যাচ্ছে। আর কোন মুসলিম নারী যদি নিজের ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রেখে চলার চেষ্টা করে এবং নিজ দেশে দুর্ভিক্ষ অথবা যুদ্ধাবস্থার কারণে সেসব দেশে আশ্রয় নিতে চায়, তাহলে তাকে অবৈধ অভিবাসী বলে সীমান্ত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এ হলো পশ্চিমের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা! এসব ফাঁকা বুলি, যা তারা সহজ-সরল মুসলিমদের ধোঁকা দিতে ব্যবহার করে থাকে।

আমরা সাম্প্রতিক সময়েও দেখেছি, আমেরিকাতে কীভাবে বর্ণবাদ মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে ! কৃষ্ণাঙ্গদেরকে শুধু বর্ণের কারণে কেমন বৈষম্যের স্বীকার হতে হয় ! আরও সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনীদের সমর্থনে মিছিল করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর আমেরিকার প্রশাসন কীভাবে চড়াও হয়েছিলো !

এই হলো গণতন্ত্রের পুণ্যভূমিতে গণতন্ত্রের দশা ! তাহলে চিন্তা করুন, বাকী দুনিয়ায় গণতন্ত্রের অবস্থা কী হবে ! গণতন্ত্রবাদীরা যে কাল্পনিক গণতন্ত্রের কথা বলে থাকে, তা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও বাস্তবায়িত হয়নি । অন্যদিকে ইসলাম কোন কল্পকাহিনী নয় । আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীরা তা যুগের পর যুগ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন ও রুপায়ণ করে দেখিয়েছেন ।

৩য় বিশ্বের কথা কী বলবো ! এখানে একটা বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সুদি ব্যাংক ও এনজিওদের কাছে গোলাম হয়ে আছে । তাদের না আছে অর্থনৈতিক মুক্তি, না আছে জীবনের স্বাদ । না আছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা । স্বাধীনতা এখানে এক "রূপ কথার গল্প" । এরপরে আছে মোটা অংকের ট্যাক্স । বেতন পকেটে ঢুকার আগে কেটে নেয়া হচ্ছে, না তার পারিবারিক খরচের হিসাব দেখা হচ্ছে । এসব হচ্ছে, গণতন্ত্রের ব্যক্তি স্বাধীনতা !

এবার আসুন অন্যদিক থেকে চিন্তা করি । ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছার ব্যাপারে স্বাধীন । এ ব্যাপারে কেউ তাকে জোরাজুরি করতে পারবে না । আমি আমার ছেলেকে নামাযের নির্দেশ দিতে পারবো না । অথচ রাসূল ﷺ বলেন–

عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْ هِ عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ

আমর বিন শুআইব (রহঃ) নিজ পিতা ও তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামায শিক্ষা দাও এবং দশ বছর হলে তার (নামাযের) উপর তাদেরকে প্রহার কর। আর বিছানায় তাদের মাঝে তফাৎ কর।– (আবূ দাঊদ ৪৯৫, সহীহুল জামে’ ৫৮৬৮)

কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব হারাম। ছেলে-সন্তান তার বৃদ্ধ মা-বাবার খোঁজ-খবর নিবে না, তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে। যার ইচ্ছা মদের বারে যেয়ে মদ খাবে। প্রকাশ্যে নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াবে; এরপর যা ইচ্ছা তাই করবে। আর ইচ্ছা হলে সে তার গোপনাঙ্গও পরিবর্তন করে ফেলবে। প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে অন্য ছেলের সাথে ঘুরে বেড়াবে, অভিভাবক তাকে কিছুই বলতে পারবে না। এমনকি চাইলে কেউ মুরতাদও হয়ে যেতে পারবে। না, এসব কোন কল্প কথা নয়। এটাই পশ্চিমে বাস্তবতা। এখন এসব তারা আমাদের দেশেও রপ্তানি করছে। আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

অর্থঃ **নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।**

আর এসবই হচ্ছে পশ্চিমা ব্যক্তি স্বাধীনতার সারমর্ম! আর গণতন্ত্র তো পশ্চিমেরই ফসল। ইসলামে এমন ব্যক্তি স্বাধীনতার কি কোন অবকাশ আছে?– আপনারাই বলুন।

৮. সকলের মতামত সমান

এই বিষয়ে আলাদা করে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না, যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতার আলোচনা মাঝে এ বিষয়ের মৌলিক আলোচনা হয়ে গেছে। এছাড়াও আমরা পরবর্তীতে "আদর্শহীনতা-ই গণতন্ত্রের আদর্শ" নামে আলাদা একটা অনুচ্ছেদ রেখেছি।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

১. **<u>প্রিসিডেন্সিয়াল গণতন্ত্র:</u>** এখানে প্রেসিডেন্ট সরাসরি জনগণের ভোট নির্বাচিত হয়। পরে উনি নিজের ইচ্ছামত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে পার্লামেন্ট গঠন করেন। এখানে রাষ্টের প্রধান হলেন প্রেসিডেন্ট।

২. **<u>পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র:</u>** এখানে জনগণের ভোটে প্রথমে পার্লামেন্ট সদস্যগণ নির্বাচিত হন। অতঃপর তাদের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। উনিই রাষ্ট্রের প্রধান। এখানে প্রেসিডেন্ট কেবলই একটা পুতুল। মূলত প্রধানমন্ত্রী-ই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এখানে প্রেসিডেন্টকে সকল প্রকার আইনের উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। উনি চাইলে মৃত্যুদ্বন্দ্ব প্রাপ্ত আসামীকেও মাফ করে দিতে পারেন।

গণতন্ত্রের ইতিহাস

গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে ইউরোপে এবং সূচনা হয়েছে ১৩শ শতকের শেষদিকে কিংবা ১৪শ শতকের প্রথম দিকে । তখন গোটা ইউরোপে ছিল চার্চের একচেটিয়া প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কর্তৃত্ব । ফলে পোপ, পাদ্রী আর পুরোহিতেরা হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা ও জনগণের ভাগ্যবিধাতা।

এসময় মুসলিম শাসিত স্পেন ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র থেকে খ্রিস্টানরা ইসলামী দর্শন, ইসলামী জীবনবিধান, চিন্তার স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু তত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করে এবং তা ইউরোপে গিয়ে প্রচার করতে শুরু করে। এর ফলে পোপতন্ত্রের কারণে চিন্তার ক্ষেত্রে যে অজ্ঞতা-মূর্খতা ও কুসংস্কার ইউরোপে ব্যাপকতা লাভ করেছিলো, তার বিরুদ্ধে নব্যচেতনাসম্পন্ন যুবকদের মনে বিদ্রোহভাব শুরু হয় এবং তারা চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা শুরু করে।

গীর্জা কর্তৃপক্ষ যখন লক্ষ্য করল যে, গীর্জার একচেটিয়া কর্তৃত্বকে যুব সমাজ চ্যালেঞ্জ করছে; তারা গীর্জার বাধ্যবাধকতা পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে রাজি

হচ্ছে না এবং চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবি করছে । তখন তারা একে নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখলো । ফলে তারা এসব যুবকদের উপর চড়াও হলো এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকমের জুলুম-নির্যাতন শুরু করলো।

অন্যদিকে গোটা ইউরোপে তখন বিজ্ঞান চর্চাও ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেলো। গীর্জা কর্তৃপক্ষ সে বিজ্ঞান চর্চাকেও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। হুকুম জারি হলো– কেউ কোন ধরনের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতে পারবে না।

কিন্তু লোকদের মনে যখন নতুন চিন্তা-চেতনার স্রোত বইতে শুরু করে, তখন তাকে আর সহজে থামানো যায় না। একদিকে এই চিন্তা-চেতনার বিস্তার ঘটতে লাগল; আর অন্যদিকে গীর্জার কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন বলে জুলুম-নির্যাতনের মাত্রাও ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগলো। যার ইতিহাস অত্যন্ত করুন এবং এতটাই মর্মান্তিক যে, গীর্জা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হয়েও এর ধর্মভীরু পোপ-পাদ্রীরা চিন্তার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনকে পুরোপুরি অস্বীকার করলো। আর যারা এই চিন্তা-চেতনা লালন করতো, তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করলো, কাউকে পুড়িয়ে মারলো, অনেককে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হলো। তাদের অপরাধ ছিলো তারা চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করতে চাচ্ছে, যে ধরনের চিন্তা-চেতনা গীর্জার পাদ্রীরা কোন দিন জনগণের সামনে পেশ করেনি; স্বাধীন চিন্তার অধিকারীরা তা-ই দাবী করে বসলো। ফলে অত্যাচার ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠলো। এদিকে অত্যাচার যতই বাড়তে লাগলো, চারদিকে বিদ্রোহের আগুনও ততই বাড়তে লাগলো। এ বিদ্রোহ আর থামানো গেলো না ।

অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে গীর্জা এবং রাষ্ট্র আলাদা হয়ে গেল । এ দু'টোকে আর এক রাখা গেল না। অবশ্য ইউরোপীয় সমাজে গীর্জা আর স্বাধীন চিন্তা-চেতনা লালনকারী লোকদের সাথে একটা সমঝোতা হলো। তা হলো এই যে, **গীর্জা নিছক ধর্মচর্চা করবে, আর রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বৈষয়িক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও পরিচালনা করবে। কাজেই এ দুটির মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকবে না** । সেজন্য এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এভাবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও গীর্জা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্র গীর্জার ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো রকম

হস্তক্ষেপ করবে না, আর গীর্জাও রাষ্ট্রের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্ম-বহির্ভূত যাবতীয় বিষয়ের পুরো কর্তৃত্ব থাকবে রাষ্ট্রের কাছে।

এরপর বিভিন্ন দেশে নিরঙ্কুশ অত্যাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই এই নব্য শিক্ষিতদের মাঝে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরী হয় এবং রাজতন্ত্র উচ্ছেদের আন্দোলন শুরু হয়। ফলে এক পর্যায়ে রাজতন্ত্রও উচ্ছন্নে যায়।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, পোপতন্ত্রে পোপ ছিলো একাধারে গীর্জার ও রাষ্ট্রের প্রধান । সেখানে আল্লাহকেই সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করা হতো । আর পোপ হলো আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি । যদিও আমরা জানি, তারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর প্রতিনিধি ছিলো না। কেননা তারা স্বহস্তে কিতাব রচনা করেছে এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যাচার করেছে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য । যেমনটা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ﷻ বলেছেন–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ * ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًاؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿۷۹﴾

অর্থঃ সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে', যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।

আর এর ফলে আল্লাহ্ ﷻ তাদের থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নিলেন।

অন্যদিকে রাজতন্ত্রে রাজাই ছিলো সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তার কথাই আইন। অনেকটা মূসা আঃ এর যুগের ফিরাউনের মত।

এভাবে পোপতন্ত্র ও রাজতন্ত্র উৎখাতের পর এই নব্যচিন্তাধারী যুবকদের মনে প্রশ্ন জাগে– তাহলে এখন সার্বভৌমত্ব কার হবে? কার হুকুমে দেশ চলবে?

ঠিক এসময় পশ্চিমা চিন্তাবিদরা এই চিন্তা নিয়ে হাজির হলেন– **যেহেতু দেশের সকল নাগরিকই দেশের মালিক, অতএব সকলের মত জেনে এবং সকলের রায় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। এটাকেই বলা হয় জেনারেল উইল বা সর্বসাধারনের মত। আর এভাবেই গণতন্ত্র মঞ্চে আসে।**

একটি ঐতিহাসিক সত্যঃ সেক্যুলারিজম ঔরসে গণতন্ত্রের জন্ম

ইতিহাস থেকে আমরা দেখলাম, ইউরোপ বিকৃত খ্রিস্টান ধর্মের জুলুম-নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পেতে এক পর্যায়ে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পুরোপুরি আলদা করে ফেলেছিলো, যা পরবর্তীতে গণতন্ত্রের আগমনের পথকে সুগম করেছিলো। আর এই কারণেই গণতন্ত্রের মাঝে ধর্মের কোন স্থান নেই। এখানে ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই । ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি কোন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে চায়, তবে সে তা করতে পারে । কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচলিত প্রথা অথবা মানবরচিত আইন অনুসারে কাজ করতে বাধ্য ।

এখানে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে সার্বভৌমত্বের মালিক বানানো হয়েছে জনগণ তথা মানুষকে। আল্লাহ্‌র হাকিমিয়্যাতকে অস্বীকার করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে মানুষের ইচ্ছার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে। ধর্মকে এখানে জালেম-স্বৈরাচারী হিসেবে মনে করা হয়। কেননা পশ্চিমারা ধর্ম বলতে বিকৃত খ্রিস্টান ধর্মকেই বুঝে থাকে। আর ইসলামের প্রতি তো তাদের রয়েছে সীমাহীন ও ঐতিহাসিক বিদ্বেষ । তাই তারা ধর্ম শব্দটি শুনতেই আঁতকে উঠে ।

প্রবাদে আছে – **ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।**

তাই গণতন্ত্রের ব্যাপারে এই কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সেক্যুলারিজম হলো গণতন্ত্রের দরজা। অন্যভাবে বললে, **সেক্যুলারিজমের ঔরসে গণতন্ত্রের জন্ম ।**

সেক্যুলারিজমের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা । এখানে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের যুক্তিযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান রয়েছে এবং এর আলোকে তার জীবনের সকল কিছু পরিচালিত হবে । আল্লাহ্‌র হুকুমের অনুসরণ কেবল ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ ইসলামে নেই । কাজেই ইসলামে দ্বীন ও রাষ্ট্র একই সূত্রে গাঁথা । এতে রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে এবং দ্বীন থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করার কোন অবকাশ নেই ।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুরআ রাহ.কে খলীফা ওলিদ ইবনে আবদুল মালিক জিজ্ঞাসা করেছিল যে, أيحسب الخليفة খলীফারা যে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের কি হিসাব দিতে হবে? পাকড়াও হবে?

আবু যুরআ রাহ. বলেছিলেন, অবশ্যই হিসাব নেওয়া হবে এবং দলিল হিসেবে তিনি কুরআন মজীদের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন–

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

অর্থ: হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। কেননা এটি তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচারদিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।– (সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ২৬)

ইবনে কাসীর রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ঠিক একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন–

هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل

অর্থ: এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাসকদের প্রতি নির্দেশনা যে, তারা যেন লোকদের মধ্যে সুবিচার করে।

বিচার একমাত্র আল্লাহর আইনেই হওয়া বাধ্যতামূলক। ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই।

আল্লামা আলুসী রহঃ তাফসীরে রুহুল মানীতে লেখেন–

> "**দ্বীন ও রাষ্ট্র এ দুটি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং এ দুটি অংশের যেকোনো একটিকে যদি পরিত্যাগ করা হয়, তবে অন্য অংশও পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে। কেননা দ্বীন হলো ভিত্তি, আর রাষ্ট্র হলো প্রহরী ও রক্ষকস্বরূপ। বলা বাহুল্য, যে ইমারতের ভিত্তি নেই, তা তো ধ্বসে পড়বেই, আর যে ইমারতের প্রহরী ও রক্ষক নেই, তা তো বিনষ্ট হবেই।**"

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে খলিফা আবু বকর রাঃ এর জিহাদের ঘোষণা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনেও ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য।

ইমাম গাযালী রহঃ বলেন–

> "**দ্বীন ও রাষ্ট্র - এ দুটি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং এ দুটির একটি অন্যটি ছাড়া চলতে পারে না।"**

তিনি অন্যত্র বলেন–

> **দ্বীনের উপর জীবনযাপন দুনিয়ার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপনা ছাড়া সম্ভব নয়। ... দ্বীন ও রাষ্ট্রক্ষমতা দুটি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। ... রাষ্ট্রক্ষমতা দুনিয়ার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য একান্ত প্রয়োজন**

আর দুনিয়ার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা দ্বীনের উপর জীবনযাপনের জন্য একান্ত আবশ্যক।

একটি সংশয়ঃ গণতন্ত্রের লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা বনাম ইসলামের চিন্তার স্বাধীনতা

ইতিহাস থেকে আমরা আরও একটি বিষয় দেখতে পেলাম তা হলো, নব্যচেতনা সম্পন্ন যুবকদের চিন্তার স্বাধীনতার দাবী থেকে পোপতন্ত্রের মসনদে আগুন, অতঃপর সেই আগুনের ছাই হতে জন্ম নেয় রাজতন্ত্র। এরই ধারাবাহিকতায় একপর্যায়ে আসে গন্ততন্ত্র। সুতরাং জন্মগতভাবে গণতন্ত্র ও চিন্তার স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামও তো চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলে। তাহলে ইসলাম ও গণতন্ত্র তো এদিক থেকে একই রকম!

এখানে আমাদের বুঝতে হবে, ইসলামের চিন্তার স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের চিন্তার স্বাধীনতা সমান বস্তু নয়। গণতন্ত্র বা পাশ্চাত্যের চিন্তার স্বাধীনতার সাথে ইসলামী চিন্তার স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো– গণতন্ত্রে চিন্তার স্বাধীনতার কোন লাগাম নেই। এটা লাগামহীন ঘোড়ার মত। যেদিকে ইচ্ছা ছুটছে তো ছুটছে। এরকম লাগামহীন ঘোড়া আরোহীর জন্য যেমন বিপজ্জনক, তেমনি এর মাধ্যমে গন্তব্যেও পৌঁছাও সম্ভব নয়।

অথচ ইসলামে এমন চিন্তার স্বাধীনতার কোন সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

অর্থঃ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার

থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।– (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৩৬)

গণতন্ত্রের চিন্তার স্বাধীনতার মাঝে এটাও শামিল যে, কেউ চাইলে আল্লাহ্ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এরও সমালোচনা করতে পারবে। হুদুদ-কিসাস ইত্যাদির মত শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানেরও সমালোচনা করা যাবে। এখানে তাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না। বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার নিরাপত্তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব।

অন্যদিকে ইসলামের চিন্তার স্বাধীনতা হলো- আল্লাহর বিধান অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এব্যাপারে কারো আলোচনা-সমালোচনা করার কোন অধিকার নেই। কেউ একথা বলতে পারবে না যে, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে রজম করা অমানবিক। অথবা কুরআন-হাদিসের বিধান এ যুগে চলে না। সে শুধু কেবল আল্লাহর বিধানে কীভাবে কার্যকর করলে ভালো হবে সেই পরামর্শ দিতে পারে।

তাই আমাদের উচিৎ গণতন্ত্রের চিন্তার স্বাধীনতার ধোঁকায় না পড়া।

গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্ ﷻ নয়, জনগণ

একটা রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় উপাদন হচ্ছে রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব কার হবে। অর্থাৎ যেকোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কে দিবেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের নিকট এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটা ছাড়া কোনভাবে রাষ্ট্রগঠন সম্ভব না।

আমরা ইতিহাস ও সংজ্ঞা থেকে দেখেছি, গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের মালিক হলো জনগণ। যেহেতু আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই গণতন্ত্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে ২ ভাগে ভাগ করে এক ভাগ আল্লাহকে দিয়েছে, যেটাকে তারা নাম দিয়েছে প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব, আরেক ভাগ নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করেছে।

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا

অর্থঃ **আর আল্লাহ যে শস্য ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেখান থেকে তারা আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে। অতঃপর তাদের ধারণা অনুসারে তারা বলে, 'এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের শরীকদের জন্য।–** (সূরা আন'আম, আয়াতঃ ১৩৬)

আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

অর্থঃ **আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'।–** (সূরা জুমার, আয়াতঃ ৩৮)

এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ ﷻ তাদেরকে মুশরিক বলেছেন। কারণ তারা আল্লাহ্ ﷻ -কে আসমান-জমিনের স্রস্টা মানলেও ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্যদের শরীক করতো।

একইভাবে এই গণতন্ত্রের আবিষ্কারক যারা তারাও প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্বকে আল্লাহ্‌র জন্য রাখলেও জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব স্থির করেছে মানুষের জন্য। অথচ আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

অর্থঃ **জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক।–** (সূরা আ'রাফ, আয়াতঃ ৫৪)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, সার্বভৌমত্বের মালিক হতে হবে এমন এক সত্ত্বা, যিনি একক ও অভিভাজ্য এবং যার ক্ষমতা সর্বত্র চলে। বলুন, এমন ক্ষমতা আল্লাহ্ ﷻ ছাড়া কার আছে? মানুষ কি কখনো এমন ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারে! মানুষ বড়জোর আল্লাহ্‌র খলিফা হতে পারে।

এই সেই গণতন্ত্র যেখানে মানুষকে আল্লাহর আসনে বসানো হয়েছে ! কেমন জানি তারা এমন বলতে চাচ্ছে, তুমি তো আসমানের রব, আর জমিনে আমরা ! আসমান তোমার হুকুমে চলতে পারে, কিন্তু দুনিয়াতে তোমার কোন কর্তৃত্ব চলবে না ।" - নাউযুবিল্লাহ !

হাকিম বনাম হুকুমের বিধান

এটা কোন লুকোচুরি নয় যে, আবু বকর রাঃ বিশিষ্ট সাহাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে খলিফা হয়েছেন । বরং এই কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না, সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে তিনি খলিফা হয়েছেন । তাহলে এখান থেকে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা দলিল পাই । কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাদের? বিশিষ্ট সাহাবীদের, যাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় '**আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ**' বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ যারা মেনে নিলে বাকী উম্মাহ মেনে নেয় ।

যাইহোক দেখা যাচ্ছে, পরোক্ষভাবে হলেও ইসলাম উম্মতের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়কে বিবেচনায় নিচ্ছে । এটা আসলে এক বাস্তবতা, যা অস্বীকার করার উপায় নেই ।

তাছাড়া এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর হাদিসও আছে–

حديث عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة**[1]**رواه مسلم.

"**তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম শাসক হলো তারা যাদেরকে তোমরা ভালোবাস, তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে । তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর, তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে । আর তোমাদের মাঝে নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর, তারাও**

তোমাদেরকে ঘৃণা করে । তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও, তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয় ।" – (মুসলিম)

সুতরাং জনগণের পছন্দ-অপছন্দের বিষয় ইসলাম বিবেচনা করে থাকে ।কিন্তু প্রশ্ন হলো কতটুকু ? জনগণ কি চাইলে আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারবে এজন্য যে, তা তাদের পছন্দ নয় ?

না, জনগণের এই এখতিয়ার নেই । আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

অর্থঃ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে ।– (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৩৬)

আমরা এখানে বিস্তারিত তাফসীলের দিকে যাচ্ছি না । আমরা এই বিষয়ে "**গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করার বিধান**" শিরোনামে আলাদা অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইন শা আল্লাহ্ ।

এখান থেকে আমাদের নিকট এতটুকু অন্ততঃ স্পষ্ট যে, জনগণের এই অধিকার নেই যে, তারা চাইলে শরিয়তের নির্দেশনা মানবে, আর চাইলে তা উপেক্ষা করবে । কিন্তু তাদের এই এখতিয়ার আছে যে, শাসক কে হবে– এটা নির্ধারণ করতে পারবে । অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আইন দিয়ে কে তাদের শাসন করবে, তা তারা নির্ধারণ করতে পারবে । আর অবশ্যই তা হবে উপযুক্ত প্রতিনিধি তথা "**আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ**" -এর মাধ্যমে।

অতএব আমরা বলতে পারি– **ইসলামে জনগণের পছন্দ-অপছন্দ হাকিমের ক্ষেত্রে; হুকুমের ক্ষেত্রে নয়** । কিন্তু গণতন্ত্রে জনগণ আল্লাহর

আইনের পরিবর্তে নিজেরাই আইন প্রণয়ন করতে পারে। এই ব্যাপারে হুকুম হলো, এটা সুস্পষ্ট কুফুরী।

শরী'য়তের দৃষ্টিতে পদ প্রার্থনা

সরকারী বা বেসরকারী যেকোন পদ চেয়ে নেয়া বা পদের লোভ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। কারণ পদ বা শাসন ক্ষমতা হলো দায়িত্ব অধিকার নয়৷ তাই স্বার্থসিদ্ধি বা নিছক নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পদ প্রার্থিতা জায়েয নেই। কেননা যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় পদ গ্রহণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সাহায্যের দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়৷ তার দ্বারা দেশ ও দশের মঙ্গল হয় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রাঃ -কে বলেছেন–

لا تسأل الإمارة، فإنَّك إن أُعطيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أُعطيتَها عن غير مسألةٍ أُعِنْتَ عليها

অর্থঃ নেতৃত্বের জন্য আবেদন করো না। কেননা যদি আবেদনের কারণে তোমাকে তা দেওয়া হয়, তাহলে তোমাকে তার দায়ভার বহন করতে হবে। আর যদি তোমাকে চাওয়া ছাড়াই নেতৃত্ব প্রদান করা হয়, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে।– (সহীহ বুখারী: ২/৯৮০ ,হামিদিয়া লাইব্রেরী ,ঢাকা ,হাদীস নং ৬৬২২)

একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন পদের আবেদনকারীকে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করতেন না। হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাঃ বলেন, একবার আমার গোত্রের দু'জন লোক হুজুর এর নিকট আবেদন জানালো, তাদেরকে যেন কোন পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে আবু মূসা রাঃ বলেন–

قال: دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمِّرنا على بعض ما ولاك الله ، وقال الآخر مثل ذلك، فقال النبي ﷺ: إنا والله لا نولِّي هذا العمل أحداً سأله، أو أحداً حرص عليه**[1]**، متفق عليه .

অর্থঃ আমিও আমার দুই চাচাতো ভাই রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলাম। তাদের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে কোন একটা দায়িত্ব দেন। অন্যজনও একই আবেদন করল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমরা এমন কাউকে এই দায়িত্ব অর্পণ করি না, যে এর আবেদন করে এবং এমন কাউকেও নয় যে এর প্রতি লোভ করে ।– (সহীহ মুসলিম: ২/১২০, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, :হাদীসনং ১৭৩৩)

উক্ত হাদীসের আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রার্থী হওয়ার উপযুক্ত নয়, সে বংশীয় বা আর্থিক প্রভাবের কারণে যদি পদ পেয়েও যায়, তার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হয় না, বরং সে জাতির অকল্যাণ ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পদ গ্রহণের কারণে সে গুনাহগার হয়, অপরদিকে আল্লাহর সাহায্য না থাকার কারণে জনগণের দায়িত্ব ও আমানত রক্ষায় অক্ষম হয়।

পক্ষান্তরে যদি কাউকে জনগণের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক নেতৃত্বভার দেয়া হয়, তাহলে তার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে দায়িত্ব গ্রহণ বৈধ। সেক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। নবীজী এমন ব্যক্তিকে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত-

تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه

নবী করীম ইরশাদ করেন, তোমরা ভাল মানুষ হিসেবে এ লোকদেরকে পাবে যারা অপছন্দ করার পর তার মধ্যে ফেঁসে যায় । – (সহীহ বুখারী: ১/৪৯৬, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, হাদীস নং ৩২৩৫)

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কেউ কেউ নেতৃত্বের আবেদন জায়েয হওয়ার উপর হযরত ইউসুফ আ. এর বক্তব্য দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন, যখন তিনি মিশরের বাদশাহ কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন–

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

অর্থঃ সে বলল, 'আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ' ।– (সূরা ইউসুফ: ৫৫)

কিন্তু দুই কারণে হযরত ইউসুফ আ. এর উক্ত বাণী তাদের পক্ষে দলীল হবে না।

প্রথমত, মিশরের বাদশা তাঁর জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত ও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানসূলভ পরামর্শে মুগ্ধ হয়ে পূর্বেই এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, তাকে মিশরের কোন একটি দায়িত্ব প্রদান করবেন, যেমনটি কুরআনে এসেছে–

وَ قَالَ الۡمَلِکُ ائۡتُوۡنِیۡ بِہٖۤ اَسۡتَخۡلِصۡہُ لِنَفۡسِیۡ ۚ فَلَمَّا کَلَّمَہٗ قَالَ اِنَّکَ الۡیَوۡمَ لَدَیۡنَا مَکِیۡنٌ اَمِیۡنٌ

বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের একনিষ্ঠ বানাবো। সুতরাং যখন (ইউসুফ আ. বাদশাহর কাছে এলেন এবং) বাদশাহ তাঁর সাথে আলোচনা করে বললেন, "নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন।" – (সূরা ইউসুফ: ৫৪)

সুতরাং বাদশাহ তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে পদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেননি, বরং নিজের ইচ্ছাতেই এরপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এছাড়া হযরত ইউসুফ আ. এরও এ ব্যাপারে পূর্ণ ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে, বাদশাহ তাঁকে কোন না কোন পদ দিবেন। বাকি ছিল শুধু এতটুকু যে, তাঁকে কোন ধরনের পদ দেয়া হবে এবং কী কাজ তাঁকে ন্যস্ত করা হবে। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফ আ. বলেছেন যে, যখন আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেনই যে, আমাকে কোন না কোন দায়িত্ব দিবেন তাহলে আমাকে ভূভান্ডারের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করুন।

বিষয়টি এ রকম ছিল না যে, জেলখানা থেকে তিনি কোন পদের জন্য দরখাস্ত করেছেন এবং সে মর্মে কোন সুপারিশ পেশ করেছেন। বরং আগত দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে মিসরবাসীদের জন্য তাঁর মত একজন আমানতদার ও বিজ্ঞ ভূভান্ডার তত্ত্বাবধায়কের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

অতএব উক্ত ঘটনা থেকে ক্ষমতা প্রার্থনার কোন বৈধতা প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয়ত, পদপ্রার্থনা নাজায়েয, এটি শরী'আতের একটি মৌলিক বিধান। তবে কিছু কিছু পরিস্থিতি এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা

সেই ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।– (ইসলাম আওর সিয়াসী নযরিয়াত, আল্লামা তকী উসমানী দা.বা.: ১৯৯, কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ, ভারত)

যেমন কোন যোগ্য আমানতদার ব্যক্তি যদি একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে, যদি সে নির্দিষ্ট পদ তলব না করে, তাহলে সে পদে এমন লোক আসবে যার হাতে জনগণ ও দ্বীনের ক্ষতি হবে এবং বদদ্বীনি ছড়াতে থাকবে এ অবস্থায় তার জন্য পদের আবেদন করার অবকাশ রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে, উদ্দেশ্য হতে হবে সমাজ সংশোধন, সম্মান হাসিলের উদ্দেশ্য হলে চলবে না।

কিন্তু গণতন্ত্রে পদই হলো মুখ্য। এজন্য পদ পাওয়ার জন্য তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নিজের পক্ষে প্রচারণা চালায়। অথচ মানুষ না খেয়ে মরে। আবার মনোনয়ন পাওয়ার জন্য ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ করে। রাসূল ﷺ বলেন–

إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة

অর্থঃ অচিরেই তোমরা নেতৃত্ব ও দায়িত্বের লোভ করবে এবং কিয়ামতের দিন তা অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।– (সহীহ বুখারি, হাদীস–৭১৪৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস–৪২১১)

ভোট কি শরিয়ত সম্মত পরামর্শ?

বর্তমানে কোন ব্যক্তি এই কুফরী ব্যবস্থাকে ইসলাম প্রমাণের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে ইসলাম প্রদত্ত শূরাদর্শনের সমার্থক প্রমাণ করতে চান এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত শোনান–

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

অর্থঃ আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমনতকে তার প্রাপকের নিকট পৌঁছে দাও। – (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৫৮)

আর ভোটও একটা আমানত। এজন্য এই আমানতও তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।

আসুন নির্বাচন ও শরীয়ত প্রদত্ত পরামর্শের দর্শনের মাঝে কতিপয় মৌলিক পার্থক্য জেনে নিই। এতে আমরা জানতে পারবো যে, ভোট সত্যিই কোন আমানত অথবা পরামর্শ কিনা। নাকি এটি একেবারেই ভিন্ন একটা দর্শন।

	শরয়ী পরামর্শ	**ভোট**
১	ইসলামে পরামর্শ নিছকই একটি রায়। এই রায় গ্রহণও করা যেতে পারে, আবার প্রত্যাখ্যানও করা যেতে পারে।	পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে যে ভোট গ্রহণ করা হয়, এতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না
২	ইসলামে যাদের সাথে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে, তারা এমন হবেন, আল্লাহ্ ﷻ যাদেরকে পরামর্শ ও রায় প্রদানের যোগ্যতা দান করেছেন।	পক্ষান্তরের গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ভোট সবার অধিকার। জ্ঞানী-মূর্খ, ব্যাভিচারী-আল্লাহর ওলী, কাফের-মুসলমান সবাই সমান। গণতন্ত্রে এদের সবার মান এক বরাবর।
৩	শরীয়তের আলোকে মুসলমানদের বিষয়ে কাফের, মুরতাদ ও যিন্দিক পরামর্শ দিতে পারে না।	কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় এরা সবাই সমান অধিকার রাখে। মুসলমানদের বিষয়েও এরা পরামর্শ দিতে পারে।
৪	কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ করা হবে, ইসলামে তা নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা উপর পরামর্শ করা	পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে তো একদিকে ইসলাম বাস্তবায়নের দাবিদার, অন্যদিকে খাঁটি সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারী দাঁড়ায়। আর জনগণ যদি সেক্যুলারদের

	যায় না। বরং এগুলোর উপর হুবুহু আমল করতে হবে।	বেশি ভোট দেয়, তবে '**জনগণের ম্যান্ডেট**'-কে সম্মান জানানো আবশ্যক হয়ে যায়।– নাউজুবিল্লাহ।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দৃষ্টান্ত

কতিপয় বখাটে হারাম ও অবৈধ কোন কাজের জন্য একত্রিত হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এবার এই হারাম কাজ কে করবে? এর ফয়সালা জনগণ করবে। যাহোক, জনগণকে বলা হল, আপনারা যাকে এই হারাম কাজের জন্য ভোট দিবেন, এবার সেই করবে। এখন যদি কোন ব্যক্তি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা বলে যে, ভাই এটা পরামর্শ আমানত। আপনিই বলুন, হারাম কাজে পরামর্শ দেয়া কি জায়েজ আছে? এটাকে কি আপনি আমানত বলবেন?

গণতন্ত্র এক মরীচিকা

"গণতন্ত্র শুরা ব্যাবস্থার অস্থায়ী বিকল্প হতে পারে।"– একটি প্রচলিত কথা। একটি জনপ্রিয়, নিস্ক্রিয়তামুখী ওজর। এবং একটি অজ্ঞতাপ্রসূত, কাল্পনিক বক্তব্য। এমন বক্তব্যের সাধারণ কারণ হিসেবে বলা হয়, "মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাস্ট্রের অধিকাংশ জনগণের নির্বাচিত নের্তৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা সংসদে জমা হয় এবং পরামর্শ ও আলোচনা সাপেক্ষে অধ্যাদেশ ও আইনের মাধ্যমে রাস্ট্র পরিচালনা করে। - তাই এমনটা 'শুরা'র মতই বলা যায়।"

প্রথমত, গণতন্ত্র বলতে মূলত বোঝানো হয় সাংবিধানিক গণতন্ত্র (Constitutional Democracy)-কে। এটি এমন এক ব্যবস্থা, যা কি না শাসনকাঠামোকে ধরে রাখে। আর তা হচ্ছে, সেক্যুলার রাস্ট্র।

পপুলিস্ট, ডানপন্থী বা ইসলামপন্থীরা যদিও নিজেদের সেক্যুলার দাবী করে না, তথাপি রাস্ট্রীয় ক্ষমতায় তারা এই কাঠামো তথা সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে যেতে সক্ষম না।

আশ্চর্য! উপকরণ তো উদ্দেশ্য হতে পারে না! মাশোয়ারা করা হলেই কি সেটা শুরা হবে!? মাশোয়ারা যদি দ্বীনের মাসলাহাতে না হয়ে সেক্যুলার শাসনের শক্তিশালীকরণে ব্যয় হয়, সেটা কি করে "শুরা" হতে পারে!? তাহলে বিয়ের দরকার কী? যিনার মাধ্যমেই তো প্রয়োজন পূরণ ও সন্তান উৎপাদন সম্ভব। ক্রিটিক্যালি চিন্তা করতে গিয়ে সরল চিন্তা ভুলে যাওয়াটাই কেমন যেন এখন সবচেয়ে বড় বিপদে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর কাছেই আশ্রয়।

কে না জানে, সেক্যুলারিজমের ভিত্তির উপর রচিত সংবিধানকে কেন্দ্রে রেখেই সংসদ আবর্তিত হয়। যার ফলে প্রকারান্তরে ডানপন্থী ও ইসলামপন্থীরা আসলেও, তারা সেক্যুলার ব্যবস্থাকে কেবল শক্তিশালী করার কাজেই নিজেদের মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় করেন, করবেন। দিন শেষে ফলাফলের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত আসে, আভ্যন্তরীণ জগতের রুহানী ঢেউ বা অতিবিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো মাসলাহা আসলে ধর্তব্য হয় না।
মোটকথা, গণতন্ত্রকে যারা কেবল সরকার পরিবর্তন প্রক্রিয়া মনে করেন, তারা এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞান রাখেন, এটাও বলাটা কঠিন।

আর যারা এ কথাটি জেনেশুনে বলেন, তারা হয় প্রতারণার শিকার বা প্রতারণার বাহক।

দ্বিতীয়ত, কোনো রাস্ট্রই, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের রাস্ট্রগুলো আসলে গণতান্ত্রিক না। অর্থাৎ, ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন কখনোই এসব রাস্ট্রে আসলে সম্ভব না। যেমন, চলমান রাস্ট্রীয় কাঠামোর মূল অংশ ধরা যায়- ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলসমূহ, আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস (যার রয়েছে বহুমুখী স্বার্থ ও শাখাপ্রশাখা), সামরিক বাহিনী ও বিচার বিভাগ। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা বিরোধী দল চাইলেও শাসনযন্ত্রের উঠানামায় অন্যতম নিয়ন্ত্রক বাকি অংশগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে না। বরং, অধিকাংশ পলিসি নির্ধারণেই তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে সমুন্নত ও অক্ষুণ্ণ রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

গণতন্ত্র এমন এক মরীচিকা, যাকে মানুষ পানি মনে করে তার পিছনে ছুটতে থাকে । এটা এমন এক অন্ধকার গোলক-ধাঁধা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষ তার গন্তব্য হারিয়ে ফেলে ।

গণতন্ত্রের মাঝে ঈমান ভঙ্গের যেসব কারণ উপস্থিত

ঈমান ভঙ্গের কারণ যেসব কারণের কথা সালাফুস সালেহীন বলে থাকেন তার মাঝে অধিকাংশই গণতন্ত্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মাঝে পাওয়া যায়, যেমন–

১. **<u>আল্লাহর ইবাদতে শরীক করা:</u>** গণতন্ত্রে আল্লাহ তায়ালার সিফাতে মিলকিয়াত তথা সার্বভৌমত্বে শুধু শরিক করা নয়, বরং অস্বীকার করা হয়েছে। সৃষ্টি জগতের একজন প্রতিপালক বা স্রষ্টা থাকলেও থাকতে পারেন। এ ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আমাদের আগ্রহ হলো কেবল জীবনব্যবস্থা নিয়ে। আর সেখানে রবের কোন দাখেল নেই। সেখানে জনগণ তথা মানুষ-ই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

আর সিফাতে হাকিমিয়্যাত তথা বিধানদাতা হিসেবে তো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে পুরোপুরিই অস্বীকার করা হয়েছে।

২. **<u>মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের মতবাদসমূহ সঠিক মনে করা:</u>**

গণতন্ত্রে মানবরচিত আইনকে আল্লাহর আইনের চেয়ে অধিকতর সঠিক ও যুগোপোযগী মনে করা হয়। এখানে মুসলিম ও মুশরিক সবাই সমান। কাফের মুশরিকদের মতামতকেও সম্মান জানতে হবে। তাদেরকে কাফির বলা সাম্প্রদায়িকতা।

৩. **<u>যদি কোন মুসলিম নবী করীম (ছাঃ)-এর দেখানো পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ পরিপূর্ণ অথবা ইসলামী হুকুমাত বা বিধান ব্যতীত অন্য কারো তৈরী হুকুমাত উত্তম মনে করে, তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে:</u>**

এখানে মানরচিত বিধানকে শুধু উত্তম মনে করা হয় না, বরং এর প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমদেরকে বাধ্য করা হয়।

৪. **<u>যদি কোন মুসলমান আল্লাহর নবী (ছাঃ)-এর আনিত বিধানের কোন অংশকে অপছন্দ করে তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যদিও সে ঐ বিষয়ে আমল করে:</u>**

এখানে রজমকে অমানবিক মনে করা হয়। মদ্যপান ও এর বিক্রিকে লাইসেন্সের মাধ্যমে হালাল করা হয়। অন্যদিকে লিভ-টুগেদার, বয়ফ্রেইন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচারকে যুগের চাহিদা মনে করে প্রমোট করা হয়।

৫. **<u>যদি কোন মুসলিম মুহাম্মাদ (ছাঃ) আনিত ধর্মের কোন বিষয়ে অথবা ধর্মীয় ছ্ওয়াব বা শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তবে সেও কাফির হয়ে যাবে:</u>**

গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রায়শঃ তাদের নেতাদেরকে হজ্ব, কুরবানী, নামাজ সহ দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে বিদ্রুপ ও কটূক্তি করতে দেখা যায়।

৬. **<u>মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা:</u>**

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রি সমূহ একথার উপর একমত যে, তারা তাদের দেশে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখবে এবং এর বিপরীতে অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাঁধা দিবে। আর এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহযোগিতা করবে।

৭. **<u>যে ব্যক্তি মনে করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরী‘আত ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে জীবন পরিচালনা করলেও জান্নাত পাওয়া যাবে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে:</u>**

প্রথমত, গণতন্ত্রে জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছুই নেই, এমনকি আল্লাহরও কোন অস্তিত্ব নেই। আবার কিছু মুসলিম দেশে, যখন গণতন্ত্রের কর্ণধারদেরকে বলা হয় যে, আপনারা এই কুফরী ব্যবস্থা থেকে সরে আসুন। দয়া করে আল্লাহর দ্বীনের পথে বাঁধা হবেন না, তখন তারা এর উত্তরে যা বলেন তা হল এরকম–

আমরা ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের কোন বৈপরীত্য দেখি না। সুতরাং তাদের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা গণতন্ত্র ও মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার-ফয়সালা করাকে জান্নাতের যাওয়ার পথে তারা কোন অন্তরায় মনে করে না।

৮. **<u>আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া:</u>** বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইনে শাসন করা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে এর উপর বাধ্য করা– এটা দ্বীন বিমুখতা নয় তো কি?

৯. **<u>এমন মনে করা যে, কিছু কিছু ব্যক্তি শরীয়তের উর্দ্ধে:</u>** পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে এই কুফরীটিও বিদ্যমান। সেখানে প্রেসিডেন্টকে সকল প্রকার আইনের উর্ধ্বে ধরা হয়।

আসলাফে উম্মত ও কালের মনীষীদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

এখন দেখা যাক, গণতন্ত্র সম্পর্কে আসলাফে উম্মত ও কালের মনীষীগণ, যারা আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা, তারা কী বলেছেন । তারা দ্বীন আমাদের চেয়েও অনেক বেশি বুঝেছেন এবং দ্বীন সম্বন্ধে অনেক বেশি জ্ঞান রাখতেন ।

১. হযরত শা অলিউল্লাহ দেহলভী রহঃ বলেন–

> শহর যখন জনবহুল হয়ে পড়ে, তখন তাদের সবার রায় সুন্নাতের হিফাজতের উপর একমত হওয়া সম্ভব নয় ।– (হুজ্জাতুল বালেগাহ)

বুঝা গেল, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বা পক্ষাবলম্বনের মুখাপেক্ষী, এখানে ইসলাম ও মুসলমানদের সফলতা প্রমাণ করা ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয় ।

২. আশরাফ আলী থানবী রহঃ বলেন–

ইসলামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কোন জিনিস নেই। নব্য আবিষ্কৃত ও সুবিদিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিছকই প্রতারণা। বিশেষত এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা মুসলমান ও বিধর্মী সদস্যদের দ্বারা গঠিত, সেটা তো অবশ্যই অমুসলিম রাষ্ট্র।– (আহসানুল ফতওয়া)

৩. মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী রহঃ বলেন–

এরা বলে, এটা নাকি মজদুর ও জনগণের রাষ্ট্র। এটা নিঃসন্দেহে কুফরি রাষ্ট্র।– (আকাইদুল ইসলাম)

৪. সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহঃ ইসলামী গণতন্ত্রের দর্শন প্রত্যাখ্যান করে বলেন-

ইসলামী গণতন্ত্র একটি অর্থহীন পরিভাষা। আমি ইসলামের কোথাও পশ্চিমা গণতন্ত্র পাইনি। তাছাড়া ইসলামী গণতন্ত্র বলতে কোন জিনিস নেই।

৫. হযরত মাওলানা কারী তাইয়িব রহঃ বলেন–

এটা (গণতন্ত্র) আল্লাহ্ তায়ালার সিফাতে মিলকিয়াতে শিরক, সিফাতে ইলমেও শিরক।

শিরকের পথ অবলম্বন করে কি কেউ ইসলামের শির বুলন্দ করতে পারে? কখনোই না।

৬. হযরত মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহঃ বলেন–

এসব ফল-ফসল পশ্চিমা গণতন্ত্রের নিকৃষ্ট বৃক্ষের উৎপাদন। ইসলামে এই কুফরি ব্যবস্থার কোনই অবকাশ নেই।

৭. হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী শহীদ রহঃ বলেন–

ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের মিল নেই, তা-ই নয়। বরং গণতন্ত্র ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়।

৮. মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ হাকিম আখতার সাহেব রহঃ বলেন–

ইসলামে গণতন্ত্র বলতে কোনো জিনিস নেই। যেদিকে ভোট বেশি পড়বে সেদিকেই সবাই যাবে, এমন কোনো বিষয় ইসলামে নেই। বরং ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, গোটা বিশ্ব একদিকে চলে গেলেও মুসলমান আল্লাহর পক্ষেই থাকে।

৯. মাওলানা সাইয়িদ আতাউল মুহসিন শাহ বুখারী রহঃ বলেন–

ইসলামের কোথায় গণতন্ত্র রয়েছে ? ইসলামের কোথাও ভোট নেই। কোথাও আপোসকামিতা নেই। ইসলাম এর অস্তিত্ব মেনে নেয়নি, এর অবদান স্বীকার করেনি।

ইসলাম আপনার নিকট আনুগত্য চায়, ভোট চায় না। আপনার রায় চায় না। "**যে রাসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো**।"

গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও বাস্তবতা

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে তারাই মনোনয়ন পায়, যাদের অঢেল টাকা আর ক্ষমতার দাপট আছে এবং যারা জনগণের হাতে 'আকাশের চাঁদ' তুলে দেয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি করতে পারে। এসব নির্বাচনে প্রার্থীদের পক্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। অসংখ্য কর্মীকে 'ক্যানভাসার' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা যেকোনভাবে ও যেকোন কথা বলে ভোট আদায়ের চেষ্টা চালায়। ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে আনতে হয়, ফেরত পৌঁছিয়ে দিতে হয়। পান-সিগারেট, চা-বিস্কুট থেকে শুরু করে বিরিয়ানী পর্যন্ত খাওয়ানোরও প্রয়োজন দেখা দেয়। আর জাল ভোটের স্রোতে ভোটের প্রকৃত ফলাফল প্রায়শঃ অজানাই থেকে যায়।

এভাবে নির্বাচনে এক-একজন প্রার্থীকে যে কত কাড়ি কাড়ি টাকা ব্যয় করতে হয়, তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। বস্তুতঃ যে প্রার্থীর জন্য এই অপরিমেয় বেহিসাবী টাকা ব্যয় করা হবে, সে-ই নির্বাচিত হওয়ার আশা করতে পারে। আর যে পারে না বা যার জন্য সেরূপ বেহিসাবী টাকা ব্যয় করা হয় না, সাধারণতঃ তার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। এরূপ নির্বাচনে ইসলামী দলের প্রার্থীকেও অনুরূপ কার্যকলাপ চালাতে হয়; না চালিয়ে কোন উপায় থাকে না। উপরন্তু তাদেরকে মুখে এই ঘোষণাও দিতে হয় যে, আমাদের ভোট দিলে আমরা ইসলামী হুকুমত কায়েম করবো। অথচ কার্যত তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয় না; বরং অনৈসলামী সংবিধানের ভিত্তিতে প্রচলিত নিয়মে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তারাও নিজেদেরকে সেক্যুলার বানিয়ে নেয় এবং পরিণামে "ইসলামী" হওয়ার সব বিশেষত্বই হারাতে বাধ্য হয়।

এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার পর এক-একজন সংসদ সদস্যের প্রধান লক্ষ্যই থাকে, কী করে ব্যয়িত অর্থ ফেরত পাওয়া যেতে পারে। তদুপরি অনুরূপ পরিমাণ অর্থ পরবর্তী নির্বাচনেও ব্যয় করার সামর্থ্য অর্জনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাকে তৎপর হতে হয়।

একে তো গণতন্ত্রে মাঝে কুফর আর শিরকের ছড়াছড়ি, তার মাঝে তার নির্বাচন পদ্ধতিতেও এত এত দুর্নীতি আর কারচুপি ! – এ যেন '**গোদের উপর বিষফোড়া**'।

গণতন্ত্রঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, আসলে সংখ্যালঘুর শাসন

এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত বা বিজয়ী প্রার্থী কখনো সর্বমোট ভোট দাতাদের অধিকাংশের প্রতিনিধি হতে পারে না। অনেকে মোট প্রদত্ত ভোটের এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-তৃতীয়াংশ পেয়েই জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে হয় কম সংখ্যক ভোটারের প্রতিনিধি, অধিক সংখ্যকের নয়।

এই কম সংখ্যক ভোটারের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরাই সংসদে গিয়ে জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ভোট দানের অধিকারী হয়ে থাকে। ফলে তারা কোন একটি সমস্যারও সমাধান করতে সক্ষম হয় না, বরং তাদের একদেশদর্শীয় চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিবেচনা ও অপরিণত-অনবহিত জ্ঞানের ভিত্তিতে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যেসব আইন পাস করা

হয়– তা জাতীয় জীবনে অসংখ্য জটিল ও কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে । তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় বটে, কিন্তু তারা সমস্যা সমাধান বা আইন পাস করার সময় ভোটদাতা জনগণের নয়, নিজেদেরই প্রতিনিধিত্ব করে । সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনমতের কোন তোয়াক্কাই করে না ।

ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তা অসহায় জনগণের উপর জগদ্দল পাথর ন্যায় চেপে বসে । নিরীহ জনধণকে শোষণ-লুণ্ঠন ও নিষ্পেষণ করাই হয় তার একমাত্র কাজ ।

এমন গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ জনদরদের মায়াকান্না করে। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে, তারা জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে তুল দেয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। অথচ জনগণের ভোটে তারাই হয় ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক । জনগণ সে ক্ষমতার এক কড়া-ক্রান্তিও অংশ পায় না। এ ব্যাপারে নেতা-নেত্রীদের মুখরোচক বুলি পরিষ্কার ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই বলা যায়, **গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, বরং সংখ্যালঘুর শাসন**।

শরীয়তের বিপরীতে আইন প্রণয়নকারীর বিধান

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ﷻ এরাশাদ করেন–

اَمۡ لَهُمۡ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوۡا لَهُمۡ مِّنَ الدِّيۡنِ مَا لَمۡ يَاۡذَنۡۢ بِهِ اللّٰهُ

অর্থঃ তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি ? – (সূরা শূরা, আয়াতঃ ২১)

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর রহঃ বলেন– হে নবী ! তারা সেই দ্বীনের (কুরআন) অনুসরণ করে না, যেই দ্বীন আল্লাহ্ ﷻ আপনাকে দিয়েছেন । বরং তারা সেই দ্বীনে (সংবিধান) বিশ্বাস করে এবং মানে, যা এই শয়তানেরা তাদেরকে দিয়েছে । চাই সেই শয়তান মানুষের মধ্য হতে হোক অথবা

জিনদের মধ্য হতে হোক। যেমন, তাদের শয়তানেরা তাদের বাহিরা, সায়িবা, ওসিলা এবং হাম ইত্যাদি হারাম করে দিয়েছে। আর মৃতজন্তু বক্ষণ করা, রক্ত পান করা এবং জুয়া ইত্যাদি হালাল করে দিয়েছে। (আর এরা নিজেদের কৃত হালাল ও হারামকে মানে)

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহঃ তাফসীরে মাযহারীতে বলেন–

> হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, "তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিপরীতে অন্য একটা জীবনব্যবস্থা তৈরী করে নিয়েছে।"
>
> এরপর বলেন–
>
> "তারা কি সেই আইন গ্রহণ করবে যা আল্লাহ্ বানিয়েছেন, নাকি সেই আইন গ্রহণ করবে যা তাঁর শরীকেরা তাদের জন্য প্রণয়ন করেছে?"
>
> এর থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি এই অধিকারকে গায়রুল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট করবে, সে তাকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করে নেবে।

যেমন ইমাম নাসাফী রহঃ বলেন–

> তারা কি সেই দ্বীন কবুল করে যা আল্লাহ্ তায়ালা বানিয়েছেন, নাকি তাদের অন্য আরও মা'বুদ ও উপাসক রয়েছে?

তিনি আরও বলেন–

> এরা যদি আল্লাহর নাযিলকৃত জীবনব্যবস্থা কবুল না করে, যা মুহাম্মাদ সাঃ নিয়ে এসেছেন, তবে নিশ্চিত তারা এই জীবনব্যবস্থা ছাড়া অন্য জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অথচ জীবনব্যবস্থা, সংবিধান বা আইনপ্রণয়নের গুণ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এভাবে তো এরা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে মা'বুদ বানানেওয়ালা হয়ে যাবে।

ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী রহঃ বলেন–

> আমি ছাড়া তাদের কি অন্য আরও মা'বুদ রয়েছে?

ইমাম নিশাপুরী রহঃ বলেন–

> তারা কি আল্লাহর তৈরীকৃত সংবিধান গ্রহণ করবে, নাকি তাদের আরও কোনো মা'বুদ রয়েছে (যারা তাদের জন্য সংবিধান রচনা করবে) ?

বোঝা গেল, এই সিফাত ও গুনে যাকে শরীক বানানো হবে, সে তার মা'বুদ । আর কারো সাথে বান্দার এই সম্পর্ক হলো 'ইবাদত' । কারণ মা'বুদ ও ইলাহা তাকেই বলা হয়, যার ইবাদত করা হয় । সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণেতা, পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্ট সদস্যরা মূলত মা'বুদ ও উপাস্য, আল্লাহর বিপরীতে যাদের ইবাদত করা হয়।

উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন–

> কোন মানুষের জন্য কোন বস্তুকে হারাম বলার অধিকার নেই । তবে হ্যাঁ, শরীয়ত যেটাকে হারাম বলেছে, কেবল সেটাকেই হারাম বলতে পারে ।

গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করার বিধান

আল্লাহ ﷻ বলেন–

وَ مَنۡ لَّمۡ یَحۡکُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡکٰفِرُوۡنَ ...وَ مَنۡ لَّمۡ یَحۡکُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الظّٰلِمُوۡنَ...وَ مَنۡ لَّمۡ یَحۡکُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারা কাফির। ... আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারা জালিম। ...

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারা ফাসিক । – (সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)

যারা আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য তিনটি উক্তি করেছেন।

এক. তারা কাফির,

দুই. তারা জালিম,

তিন. তারা ফাসিক।

এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও তাঁর অবতীর্ণ আইন পরিত্যাগ করে নিজের বা অন্য মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে ফয়সালা করে, সে আসলে তিনটি মারাত্যক অপরাধ করে।

প্রথমত, তার এ কাজটি আল্লাহ তায়ালার হুকুম অস্বীকার করার শামিল । কাজেই এটি কুফরি ।

দ্বিতীয়ত, তার এ কাজটি সুবিচারের পরিপন্থি। কারণ, কেবল আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানগুলোই হলো পুরোপুরি ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক। কাজেই তাঁর হুকুম বাদ দিয়ে যখন সে অন্য কিছু দিয়ে ফয়সালা করল, তখন সে প্রকৃতপক্ষে জুলুমই করল।

তৃতীয়ত, বান্দা হওয়া সত্ত্বেও যখন সে আপন প্রভুর আইন অমান্য করে নিজের বা অন্যের মনগড়া আইন অনুযায়ী ফয়সালা করল, তখনই সে দাসত্ব ও আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেল। আর এটি অবাধ্যতা বা ফাসিকি।

যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে ভুল, অযৌক্তিক কিংবা অকল্যাণকর মনে করে এবং নিজের বা অন্য কোনো মানুষের হুকুমকে সঠিক ও অধিকতর কল্যাণকর মনে করে আল্লাহর হুকুমের বিরোধী ফায়সালা করে, সে পুরোপুরিই কাফির ।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর তায়ালার হুকুমকে সঠিক, কল্যাণকর ও ইনসাফভিত্তিক বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু কার্যত তাঁর বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে ইসলাম থেকে খারিজ না হলেও ভয়ংকর রকমের অপরাধী তথা ফাসিক ও জালিম।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাঃ বলেন–

> **"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে । আর যে আল্লাহর বিধানকে সত্য বলে স্বীকার করে; কিন্তু কার্যত তাঁর বিরুদ্ধে ফায়সালা করে, সে জালিম ও ফাসিক ।"** – (তাফসীর ইবনু কাসীর)

তাছাড়া কুফরীর যেমন প্রকারভেদ রয়েছে, জুলুম ও ফিসকেরও তেমনি প্রকারভেদ রয়েছে । যেমন, লুকমান হাকিম তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন–

وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِہٖ وَ ہُوَ یَعِظُہٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰہِ ؕ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ

অর্থঃ আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম' । – (সূরা লুকমান, আয়াতঃ ১৩)

এই আয়াতে শিরককে বড় জুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে । অথচ আমরা জানি, শিরক এমন পাপ যা মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয় । সুতরাং এখানে বড় জুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুফর । অর্থাৎ যেটা বড় জুলুম সেটা কুফর । আর ছোট জুলুম বলতে সাধারণ জুলুমকে বুঝায় যা কবীরা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে । অতএব সূরা মায়েদার ৪৫ নং আয়াতে "**জালিম**" বলতে যদি আমরা বড় জালিম ধরে নিই, তাহলে ৪৪ নং আয়াতের সাথে আর কোন বিরোধ থাকে না । অনুরূপ বক্তব্য ফাসিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । তখন ৩টি আয়াতের অর্থই হবে– যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করে না, তারা কাফির ।

গণতন্ত্র একটি জীবনব্যবস্থা

ইসলামে 'শরীয়ত' শব্দটি যেই অর্থে ব্যবহৃত হয়, গণতন্ত্রে একই অর্থে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলে থাকি, এই কাজটি শরীয়ত সম্মত, এই কাজটি শরীয়ত পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বলা হয়, এই কাজটি আইন সম্মত এবং এই কাজটি আইন বিরোধী।

আকিদা অর্থে চিন্তাধারা

'আকিদা' শব্দটি শরীয়তে যেই অর্থে ব্যবহৃত হয়, গণতন্ত্রে একই অর্থে 'চিন্তাধারা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজন্য গণতন্ত্রী কোন ব্যক্তি যখন এ কথা বলে যে, আমার চিন্তাধারা এই, তার অর্থ সে বলছে, আমার আকিদা এই।

হালাল অর্থে 'আইন সম্মত'

ইসলামী শরিয়তে বৈধতা বুঝাতে যেভাবে 'হালাল' শব্দ ব্যবহৃত হয় থাকে, তেমনিভাবে গণতন্ত্রে বৈধতা বুঝাতে 'আইন সম্মত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় যদি বলা হয় 'মদ বিক্রি করা এবং মদ পান করা আইন সম্মত', এর অর্থ হলো গণতন্ত্রের সমাজে মদ পান করা এবং মদ বিক্রি করা হালাল। এমনিভাবে সুদি লেনদেন করাও হালাল।

হারাম অর্থে বেআইনি

মদ্যপায়ীর সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও আশি বেত্রাঘাত করা 'বেআইনি'। এ কথার অর্থ হলো, সাক্ষী থাকার পরও মদ্যপায়ীকে আশি বেত্রাঘাত করা হারাম।

পরিভাষা ও অন্যান্য বাস্তবতার বিচারে গণতন্ত্র ইসলাম ব্যতিত সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জীবনব্যবস্থা।

এই দ্বীনের ইলাহা কে? – জনগণ। আরও স্পষ্ট করে বললে, হাওয়া তথা প্রবৃত্তি হলো গণতন্ত্র পূজারীদের রব। যেমনটা আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

اَفَرَءَيۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلۡمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰی سَمۡعِهٖ وَ قَلۡبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰی بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنۡ یَّهۡدِیۡهِ مِنۡۢ بَعۡدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ ﴿۲۳﴾

অর্থঃ তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?
– (সূরা জাসিয়া, আয়াত: ২৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মা'রেফুল কুরআনে মুফতি শফি রহঃ বলেন–

> ইবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মোকাবিলায় অন্য কারোও আনুগত্য অবলম্বন করে তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েজ-নাজায়েজ পরোয়া করে না, আল্লাহ যে কাজকে হারাম বলেছেন সে তাতে আল্লাহর আদেশের পরিবর্তে নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, সে মুখে খেয়ালখুশিকে উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে খেয়ালখুশিই তার উপাস্য।
>
> হযরত আবু ওমামা রাঃ আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আসমানের নিচে ও জমিনের উপরে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়ালখুশি।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে বলা হয়–

> সেটাকে-ই সে ভাল মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি ভাল মনে করে এবং সেটাকে-ই সে মন্দ মনে করে, যেটাকে তার প্রবৃত্তি মন্দ মনে করে।

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যাবতীয় বিধি-বিধানের উপর স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে বেশি প্রাধান্য এবং গুরুত্ব দেয়। অথচ জ্ঞান-বুদ্ধিও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা স্বার্থপরতার শিকার হয়ে প্রবৃত্তির মত ভুল ফায়সালাও করতে পারে।

আর উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ গণতন্ত্রের উপাসকদের সাথে পুরোপুরি মিলে যায় । এছাড়া দেশ প্রতিমার পূজা তো আছে । গণতান্ত্রিকেরা যখন দেখে তাদের গণতান্ত্রিক সরকারের উপর স্বৈরাচারের ভূত চেপে বসেছে, তখন তারা দেশপ্রতিমার নামে তাকবীর দিতে শুরু করে । যাইহোক, দেশ রক্ষা আর ইসলাম রক্ষা একই কথা না ।

এই দ্বীনের ধর্মগ্রন্থ কী? – সংবিধান।

আরবের মুশরিকেরা নিজেদের জন্য নিজেরা মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করতো, আল্লাহ্ ﷻ তাদের এসব কর্মকাণ্ডকেও দ্বীন বলেছেন–

لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ

অর্থঃ তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য; আমার দ্বীন আমার জন্য ।– (সূরা কাফিরুন, আয়াত: ০৬)

সুতরাং গণতন্ত্র ইসলামের বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জীবনব্যবস্থা তথা ভিন্ন একটি দ্বীন।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡہُ ۚ وَ هُوَ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۸۵﴾

অর্থঃ আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।– (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৮৫)

অন্যত্র তিনি ﷻ বলেন–

اِنَّ الدِّيۡنَ عِنۡدَ اللّٰهِ الۡاِسۡلَامُ ۟ وَ مَا اخۡتَلَفَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡيًۢا بَيۡنَهُمۡ ؕ وَ مَنۡ يَّكۡفُرۡ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ ﴿۱۹﴾

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম।– (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৯)

হাদীসে রসূল ﷺ বলেছেন–

''**সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ আছে! ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের যে কেউ আমার উপর ঈমান না এনেই মারা যাবে, সে জাহান্নামী হবে।**''
–(সহীহ মুসলিম)

তিনি ﷺ আরো বলেন–

''আমি সাদা-কালো সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ, সকল মানুষের জন্য নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি) ।– (বুখারী ও মুসলিম)

আর এই কারণেই তিনি সেই সময়ের সমস্ত বাদশাহদের প্রতি পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন।– (ইবনে কাসীর)

গণতন্ত্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের হুকুম

এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে, গণতন্ত্র একটি কুফরী জীবনব্যবস্থা ও ইসলাম ভিন্ন অন্য একটি দ্বীন । তথাপি এরা সাথে জড়িত সবাইকে কাফির ফতওয়া দেওয়া সঠিক নয় । কেননা কোন ব্যক্তির কথা ও কাজ কুফরী হওয়া, আর তাকে কাফির ফতওয়া দেওয়া এক বিষয় নয়। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় । কাউকে কাফির আখ্যা দেওয়ার বিষয়টিকে শরীয়তের পরিভাষায় তাকফির বলা হয় । এটি ২ ভাগে বিভক্ত–

ক) <u>**তাকফিরে মুতলাকঃ**</u> কোন কথা বা কাজ সম্পর্কে এই কথা বলা যে, এটা কুফর । এতে কথা ও কাজের সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়, কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা হয় না।

খ) <u>**তাকফিরে মু’আইয়িনঃ**</u> কোন কথা বা কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফির বলা। এখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর হুকুম দেওয়া হয় ।

দ্বিতীয় প্রকার তাকফীরের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর । সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, এটা সাধারণ কোন আলিমেরও কাজ নয় । এই কাজের জন্য একটা বিশেষ পর্যায়ের ইলমী গভীরতা থাকতে হয় ।এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম শুধুমাত্র সত্য গোপন করার অপরাধে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে ফতওয়া দিবেন ।

যাহোক আমরা এখানে তাকফীরের প্রথম প্রকার নিয়ে আলোচনা করছি । ২য় প্রকারের আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয় । এখন গণতন্ত্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাধারণ হুকুম জানবো, ইন শা আল্লাহ্ ।

১) যারা গণতন্ত্রকে আইনের একটি উৎস হিসেবে অথবা বৈধ বিধিবিধান হিসেবে বিবেচনা করে অথবা তারা হয়তো এসবে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা এটা দিয়ে আইনপ্রণয়ন করে ।

<u>হুকুমঃ</u> অন্য যত কিছুই করুক না কেন, এরা কাফির ।

২) যারা চালাকির শিকার অথবা তাদের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বা তাদের দ্বারাই তা সূচিত হয়েছে । তারা এটাও জানে যে, গণতন্ত্র হলো কুফর এবং তা ইসলামে বৈধ নয়, তথাপি তারা এই আশায় এতে শরীক হয় যে, তারা কোন শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করতে না পারলেও অন্ততঃ বিরোধীতার মাধ্যমে শরীয়াহ বিরোধী আইন যাতে বন্ধ করতে পারে । নিশ্চিতভাবে তাদের এই কাজটি ভুল, কিন্তু তাদেরকে তাকফীর না করে মুসলিম মনে করাই নিরাপদ, যেহেতু তাদের নিকট একটি তাওয়িল রয়েছে ।

৩) মানবরচিত আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং এর জন্য নিজেদেরকে গুনাহগারও মনে করে না। এর পিছনে শরয়ী কোন ওজর নেই।

হুকুমঃ এটা কুফরে আকবর যা মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয়।

৪) মানবরচিত আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে, কিন্তু এর জন্য নিজেদেরকে গুনাহগারও মনে করে। এরা শুধু এই নিয়তে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছে যে, ক্ষমতাসীনেরা যেহেতু এছাড়া অন্য কোন আইন প্রবর্তন করতে দিবে না, তাই জনগণের বৈধ অধিকার তাদেরকে দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে কাজ করছে। শরয়ী আইন প্রবর্তনের সুযোগ পেলে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকবে না। শরয়ী আইন প্রবর্তনের পক্ষে কাজ করবে এবং সে অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করবে।

হুকুমঃ এরা কুফরে আসগরে লিপ্ত। এটাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গুনাহ। তবে এটা দ্বীন থেকে খারিজ হওয়ার কারণ নয়। বরং এতে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসেক ও জালিম হিসেবে বিবেচিত হবে। এদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এদের চাকুরী করাও হারাম এবং এর বেতন-ভাতাও হারাম।

ভোট প্রদানের শরয়ী হুকুম

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে একজন ভোটদাতা কারো পক্ষে যখন ভোট দেয়, তখন তার এই ভোট দানের অর্থ হলো- নিঃশব্দে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে, "আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছামত যেকোন আইন পাস করার ক্ষমতা দিচ্ছি এবং তুমি অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে যে আইনই পাস করবে, আমি তা নির্দ্বিধায় মেনে নিবো।"

কুরআনের দৃষ্টিতে আইন রচনার এইরূপ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আল্লাহ্ ﷻ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া সুস্পষ্ট শিরক। কেননা এর ফলে মানুষ মানুষের গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া তার পক্ষে আর কোনক্রমেই সম্ভব হয় না।

আর এভাবে যারা মানুষকে নিজেদের গোলাম বানাতে চায়, তারা যেন নিজেকে ফিরাউনের মত রব দাবী করলো।

সুতরাং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট প্রদান সাধারণভাবে একটি জঘন্য শিরক ও কুফরী কাজ। তবে এর সাথে জড়িত সবাই কাফের কিংবা মুশরিক নয়।

যারা ভোটদানের সাথে জড়িত, তারা প্রধানত ৩টি শ্রেণীতে পড়ে–

১। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, নিজেরা নির্বাচিত হতে পারলে খুশীও হতো এবং সুযোগ থাকলে আইনপ্রণয়নও করতো।

<u>হুকুমঃ</u> এরা কুফরে আকবরে লিপ্ত যা দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয়। কিন্তু আমরা তাদের সম্পর্কে কেবল তখনই জানতে পারি, যখন তারা তাদের বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করে।

২। যারা এই কারণে ভোট দেয় যে, তাদেরকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে অথবা দুনিয়াবী অর্জনের প্রতিশ্রুতি কিংবা এরূপ কিছু।

<u>হুকুমঃ</u> এরা ফাসিক। এরা শুধুমাত্র শোচনীয় মূল্যে নিজেদের দ্বীনকেই বিক্রি করছে না, বরং নিজেদেরকেও বিক্রি করে দিচ্ছে।

৩। এমন মুসলিমগণ যারা প্রতারিত হয়েছেন পথভ্রষ্ট আলিম, জাহিল অথবা খারাপ কাজের মুখপাত্রদের দ্বারা যারা খারাপকে সুন্দররূপে উপস্থাপন করে।

এই তৃতীয় শ্রেণীটি আবার ৩টি ভাগে বিভক্ত-

ক) <u>**আলিমদের অন্ধ-অনুসরণকারীঃ**</u> যারা ভোটদানের বিধান জেনেও শুধুমাত্র তাদের আলিমদের অন্ধ-অনুসরণের কারণে তাতে অংশ নেয়।

হুকুমঃ এরা মুশরিক, কেননা অন্ধ-অনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক করেছে।

খ) **<u>ভুল ব্যাখ্যা বা তাওয়ীলের শিকারঃ</u>** যারা তাদের আলিমদের এই হুমকির শিকার যে, *যদি তারা ভোট প্রদান না করেন, তবে এর মানে দাঁড়ায় যে, তারা কথার মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করছে না।*

অথবা তাদেরকে এই হুমকি দেওয়া হয়েছে যে, *তারা যদি ভোট না দেন এবং পার্লামেন্ট-এ তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ধর্মের নেতাদের নির্বাচন না করেন, তবে শরীয়ার অবস্থা যা আছে তার চেয়েও খারাপ হবে।*

হুকুমঃ এরা ভুল পথে আছে, তবে নিশ্চিতভাবে এরা কাফির কিংবা মুনাফিক নয়, যেহেতু তাদেরকে এক ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

গ) **<u>যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছেঃ</u>** এদেরকে বিভিন্ন মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

হুকুমঃ এদের হুকুম নির্ভর করবে, এদেরকে কতটুকু বাধ্য করা হয়েছিল এবং এর থেকে বাঁচার কোন সুযোগ ছিলো কিনা। কিন্তু আমাদের পক্ষে এ সকল লোকদের বিচার করা সঠিক হবে না।

আদর্শহীনতা-ই গণতন্ত্রের আদর্শ

গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট কোনো আদর্শিক মানদণ্ড নেই। এখানে জনগণের ইচ্ছাই হলো ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। আর জনগণের ইচ্ছা যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই গণতন্ত্র কোনোভাবেই স্থায়ী ও সুদৃঢ় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না; বরং এতে সুবিদাবাদী বহুরূপীভাব সুস্পষ্টভাবে

পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে গণতন্ত্রকে একটি আদর্শহীন নীতিনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থাও বলা হয়।

যেমন মদ্যপান যুক্তি, বুদ্ধি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর কাজ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের জোরেই ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় শাসনতন্ত্রের ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববর্তী আইন বাতিল করে মদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়।

তদ্রূপ জাতিসংঘের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন শীর্ষক কায়রো সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের জোরেই সমকামিতা, বহুগামিতা, গর্ভপাত ও অবৈধ যৌনাচারের মতো অতিশয় বীভৎস কুকর্মগুলোকে বৈধতা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ইসলামী ও ভ্যাটিকানের ধর্মীয় পক্ষের প্রতিরোধ ও দৃঢ় অবস্থানের কারণে তা পুরোপুরি সফল হয়নি। তবে ব্রিটেন, আমেরিকাসহ পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতামতের জোরে এ সমস্ত জঘন্য অপরাধগুলোকে আইন করে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

জনগণ বাস্তবে কী চায় এবং তাদের কী দরকার– তা নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন বিষয়। মূলত জনমত বলে তা-ই চালিয়ে দেওয়া হয়, যার ব্যাপারে কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থ জড়িত থাকে। উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বেশির ভাগ মানুষ অশিক্ষিত, সেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত ইচ্ছা নিরূপণ করা এক কঠিন ও জটিল বিষয়। অধিকিন্তু ধূর্ত শাসকগোষ্ঠী জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্খার উপর নানাভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকে। ফলে অশিক্ষিত ও অভাবী লোকদের ইচ্ছার প্রকৃত অর্থে কোনোরূপ প্রতিফলন হয় না বললেই চলে।

পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্র কিছু সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এখানে আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত বিধিবিধান ও তাঁর রাসূল ﷺ প্রদর্শিত আদর্শ ও উত্তম গুণাবলী দ্বারা জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে হতে পারে না; এসব শাশ্বত মূল্যবোধের ব্যাপার। এসবে পরিবর্তন সাধনের এখতিয়ার কারও নেই। আল্লাহ ﷻ বলেন–

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

অর্থঃ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে । – (সূরাঃ আহযাব, আয়াতঃ ৩৬)

ইসলামি রাষ্ট্রের জনগণ লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারী নয়। রাষ্ট্রের আইনকানুন, মানুষের জীবনযাপনের মূলনীতি, অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি সবকিছুই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হতে হবে– এমন নয়। এমনও হতে পারে না, যে দিকে জনগণ ঝুঁকে পড়বে, ইসলামি রাষ্ট্রও সে দিকেই কাত হয়ে পড়বে।

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ কথাটি ইংরেজী Nationalism এর অনুবাদ, যা Nation (জাতি) শব্দ হতে উদ্ভূত। আরবীতে قومية অর্থ জাতীয়তা, যা قوم (জাতি) শব্দ হতে উদ্ভূত।

একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা, শান্তি ও অগ্রগতি এবং বহির্বিশ্বে উজ্জল ভাবমূর্তি অনেকাংশে নির্ভর করে সে জাতি কতটা সুসংহত, জাতীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত এবং ঐক্যের বাধনে সংঘবদ্ধ তার ওপর। তবে প্রশ্ন হল, এই জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের ভিত্তি কী হবে? এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে বিপরীতমুখী দুটি দর্শন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১.ইসলামী দর্শন।

২.গণতান্ত্রিক দর্শন।

ইসলামী দর্শন: জাতীয়তা বা জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হল দ্বীন। এখানে বংশ, বর্ণ, ভাষা কিংবা ভৌগলিক সীমারেখার কোন ভূমিকা নেই। আর সত্য দ্বীন যেহেতু কেবল ইসলাম, এছাড়া বাকী সব অসার এবং মিথ্যা, কাজেই এই দৃষ্টিকোণ থেকে সারা বিশ্বের সত্য দ্বীনের অনুসারী মুসলমান হল এক জাতি এবং সমস্ত মিথ্যাধর্মের অনুসারী কাফের। চাই তারা হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ কিংবা ইসলাম ভিন্ন অন্য যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন, এক জাতি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ﷻ ইরশাদ করেন:

১. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থ: প্রকৃতপক্ষে সকল মুসলমান ভাই ভাই ....।– (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১০)

২. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ্ তা ভালভাবে দেখছেন।– (সূরা তাগাবুন, আয়াত: ২)

৩. وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

অর্থ: আপনি বলে দিন, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তো সত্য এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর অবলম্বন করুক .... | – (সূরা কাহফ, আয়াত: ২৯)

৪. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّه

অর্থ: সকল মুসলমান এক ব্যক্তির ন্যায়। যদি তার চোখে ব্যথা অনুভূত হয়, তাহলে পুরা দেহে তা অনুভব হয় আর যদি মাথায় ব্যথা অনুভব হয়, তাহলে পুরা দেহে তা অনুভব হয় ...।– (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৬৭)

৫.   الكفر ملة واحدة ...

অর্থ: সমস্ত কাফের এক জাতি।– (মুয়াত্তায়ে মালেক, হাদীস: ৭২৮)

পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের দর্শন হল: ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত বিষয়। রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হবে বংশ, ভাষা বা ভৌগলিক অবস্থান। এই দর্শন মতে, প্রতিটি দেশ এক একটি জাতি, চাই সে দেশের নাগরিক যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন। বংশ, ভাষা ও ভৌগলিক সীমারেখার আলোকে জাতীয় ঐক্য নির্ণয়ে গণতান্ত্রিক এই দর্শনই জাতীয়তাবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

জাতীয়তাবাদ সংহতি, নাকি বিভক্তি?

গণতান্ত্রিক দর্শন মতে, যদি জাতীয় ঐক্যের মানদণ্ড নির্ণয় করা হয় ভৌগলিক অবস্থানকে, তবে এতে করে একই দেশের জেলা ও প্রদেশগুলো ধর্ম, বর্ণ কিংবা ভাষার ভিত্তিতে স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠবে এবং মানব জাতি ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বৈরিতা ও সংকীর্ণতার আঁধারে হারিয়ে যাবে।

বস্তুত: Nationalism বা জাতীয়তাবাদ এমন একটি থিওরি যা মুসলমানদেরকে শতধা বিভক্ত করে তাদের মেরুদণ্ড চিরতরে ভেঙ্গে দিয়েছে। ইসলাম এই দর্শনকে কোনভাবেই সমর্থন করে না। কেননা সমগ্র আদম সন্তান পরস্পরে ভাই ভাই এবং সারা পৃথিবীর মানবকুল একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আর এই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও ইসলাম। কেননা হযরত আদম আ. ছিলেন ঈমানদার এবং তাওহীদে বিশ্বাসী একজন পয়গম্বর।

এর বিপরীতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করা এবং ভিন্ন জাতি বা দল সৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে কুফর । অতএব যে ব্যক্তি কাফের হয়ে গেল, সে এই মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করে দিল। কাজেই মানব জাতির মধ্যে দল বা উপদল সৃষ্টি শুধু ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতেই হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, গোত্র বা ভৌগলিক স্থানের মধ্য থেকে কোনটাই মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারে না। একই পিতার সন্তান যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে, কিংবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা পরস্পরে গঠন আকৃতি ভিন্ন হয়; তাহলে তাদের এই বর্ণ, ভাষা ও স্থানের

ভিন্নতা স্বত্বেও তারা পরস্পরে ভাই। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, আভিধানিক অর্থে দেশ বা গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে জাতি শব্দের ব্যবহার করা যেতে পারে। কুরআনে কারীমেও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের গোত্রীয় লোকদেরকে "ইয়া কওমী" বলে সম্বোধন করেছেন। অথচ তার গোত্রের লোকেরা কাফের ছিল। এতে বোঝা যায়, আভিধানিক অর্থে গোত্রীয় লোকদেরকে জাতি বলা যায়। তবে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি এর উপর রাখা যায় না।

মোট কথা, কুরআন হাদীসের ভাষায় জাতীয়তার ভিত্তি হল দ্বীন । গোটা বিশ্বে দুটি মাত্র জাতি– একটি মুসলিম, অপরটি কাফের। শরী'আতে উত্তরাধিকারের বিধানেও সমস্ত কাফের সম্প্রদায়কে এক জাতি আর মুসলমানদেরকে আরেক জাতি গণ্য করা হয়েছে। যদিও তারা এক মায়ের গর্ভজাত বা একই বাপের ঔরসজাত হোক না কেন।

আমরা পূর্বে "রাজনৈতিক দল" শিরোনামের অধীনে দলাদলি ও জাতীয়তার ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের নসসমূহ এবং সীরাতে নবীব থেকে কয়েকটি ঘটনা দেখেছি । আল্লাহর রাসূল ﷺ জাতীয়তাবাদ ও দলাদলিকে কুফর, জাহেলিয়্যাত ও দুর্গন্ধযুক্ত আচরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ।

আমরা যদি সাম্প্রতিককালের ইতিহাসের দিকেও তাকাই, তাহলেও আমরা দেখতে পাবো যে, জাতীয়তাবাদের কারণে এই উম্মাহর উপর নেমে এসেছিলো ভয়াবহ দুর্যোগ ও বিপর্যয় । যার পরিণতিতে মুসলিম উম্মাহ খিলাফার ন্যায় বিশাল নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে ইয়াতিমের ন্যায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয় । ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের ময়দানে অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছায় যে, মুসলিমদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করা সম্ভব নয় । তখন তারা মুসলিমদের মাঝে ফাটল ধরাতে জাতীয়তাবাদকে বেছে নেয় । অবশেষে আরব জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে আরবদেরকে উসমানী সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামায় এবং ব্রিটেন তাদেরকে এই যুদ্ধে পিছনে থেকে সব ধরনের সাহায্য করে ও শক্তি যোগায় । ফলে উসমানী সম্রাজ্যের পতন ঘটে ও সাইকাস-পিকট চুক্তি অনুযায়ী ইসলামী সম্রাজ্যকে অনেকগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিয়ে সেখান মুসলিম নামধারী কিছু পুতুল সরকারকে বসায় । আর সর্বশেষ মুসলিম বিশ্বের উপর ইসরাইলকে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়ে দেওয়া হয়।

তাই যারা ফিলিস্তিনী ভাই-বোনদের শাহাদাতে ব্যথিত, তারা এই জাতীয়তাবাদ নামক বিষ বৃক্ষকে চিনে রাখুন। আপনারা এই ধারে কাছেও যাবেন না। রাসূল সাঃ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো! আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়া'র ভিত্তিতেই।– (মুসনাদে আহমাদ সহীহ সানাদ হা/২৩৪৮৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫১৩৭)

আজকের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ কিংবা ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ যা-ই বলা হোক না কেন, তা সবই ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী। কোন মুসলমান তা সমর্থন করতে পারে না। কারণ তা দ্বীন ও ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও হুমকিস্বরূপ।

গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ

গণতন্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে মানুষ নীতিসিদ্ধ ও নীতিবিবর্জিত নানা উপায়ে সম্পদের অবাধ মালিকানা লাভের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে অতি সহজেই বড়ো বড়ো পুঁজিপতি ও ধনকুবের জন্ম নেয়, যারা রাষ্ট্র ও সরকারের সকল ক্ষেত্রেই নিজেদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাববলয় তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। এ কারণে সেখানে দেশের গরিব ও কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদুপরি সেখানে সমাজের লোকদের মধ্যে দুটি শ্রেণি তৈরি হয়। একটি
হলো– ভাগ্যবানের দল; তারা বিপুল ধনসম্পদের মালিক হয়। অপরটি হলো– হতভাগ্য দরিদ্রের দল; যাদের দু'বেলা পরিমাণ খাদ্যও জোটে না। একদিকে কিছু লোকের সম্পদের প্রাচুর্য, অপরদিকে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরে গেলেও তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। কারণ, এ ব্যবস্থা মনে করে যে, সম্পদ তার নিজের এবং সে নিজেই তা উপার্জন করেছে এবং খরচও করবে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ।

পুঁজিবাদের বীভৎস চেহারা

ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্ট তাদের বিভৎস চেহারা বিশ্বের সব দেশেই ফুটিয়ে তুলেছে। ম্যাকডোনাল্ডস প্রতিদিন বিশাল পরিমাণের খাবার ফেলে দেয়, যা রান্নার পর অতিরিক্ত থেকে যায়। কিছু হয়ত অভাবী ও গৃহহীন মানুষদের দেওয়া হয়, কিন্তু অধিকাংশই ফেলে দেওয়া হয়। তার সাথে যোগ হয় অন্যান্য খাদ্যোৎপাদন-কোম্পানীগুলোর ফেলে দেওয়া খাবার। পরবর্তীতে এগুলো আবর্জনার কোম্পানীগুলোর দ্বারা সার অথবা পশুর খাদ্য হিসেবে অথবা মাটি ভরার কাজে ব্যবহৃত হয়। এভাবে, লাখ লাখ টন খাবার বিশ্বব্যাপী ধ্বংস হচ্ছে, যদিও লাখ লাখ মানুষ হয় নিয়মিত খাবার থেকে বঞ্চিত অথবা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে।

অনেক বিশাল বানিজ্যিক খাদ্য উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলোর নিয়ম হল, তারা অতিরিক্ত খাদ্য ফেলে দেয়, যেহেতু তারা অতিরিক্ত খাবার বিনামূল্যে বিতরণকে বানিজ্যিকভাবে লাভজনক বলে বিশ্বাস করে না। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন পাশ্চাত্যের দেশে এবং বিশেষভাবে ইউরোপে কিছু নাম যেমনঃ বাটার মাউন্টেইন, মিল্ক লেইকস এবং গ্রেইন মাউন্টেইন- ইত্যাদি খুবই পরিচিত। অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনের ফলাফল স্বরূপ জমে থাকা দুধ, ময়দা, মাখন, চিজ ইত্যাদি বোঝাতে এই নামগুলো ব্যবহার করা হয়, যা স্বল্প মূল্যে বিক্রয় অথবা দরিদ্র জাতিসমূহে বিনামূল্যে বিতরণ না করে বরং বছর শেষে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদরা যুক্তি দেখায় যে, এসব খাদ্য ধ্বংসের মাধ্যমে আর্থিক মার্কেটের স্থিতাবস্থা বজায় থাকে এবং আসলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি রক্ষা হয়। অথচ এসব পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে।

ইসলাম ও পুঁজিবাদ

পক্ষান্তরে ইসলাম একটি পুঁজিবাদ বিরোধী আদর্শ। ইসলাম আর দশটি ধর্মের মত কোনো ধর্ম নয়; আংশিক বা খণ্ডিত কোন জীবন ব্যবস্থা নয়, বরং ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম শুধুমাত্র কতগুলো নীতি নৈতিকতার সমষ্টি নয়, আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যেও ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন যা শুধুমাত্র কতগুলো আহকাম বা বিধিনিষেধ পালনের মধ্যে দায়িত্ব শেষ করে না। বরং ইসলাম বিশ্বাসীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে সামাজিক দায়িত্ববোধ। ইসলাম সন্ন্যাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় না। যাবতীয় অনর্থক কর্মকে

ইসলাম নিষিদ্ধ করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুমিনকে করে দায়িত্ব সচেতন । সূরা ইমরানে কুরআন বলছে-

كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤمِنونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَو آمَنَ أَهلُ الكِتابِ لَكانَ خَيرًا لَهُم ۚ مِنهُمُ المُؤمِنونَ وَأَكثَرُهُمُ الفاسِقونَ

অর্থঃ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদের পাঠানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা যাবতীয় সৎকর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার এর মূলোচ্ছেদ করবে।" – (সূরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১১০)

মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার জন্য এত স্পষ্ট বক্তব্য কোনো ধর্মে এমনকি কোনো মতাদর্শে পাওয়া যাবে না। এর মানে ইসলাম মুমিনকে তখনই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেয় – যখন সে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অব্যবস্থাপনার সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করার মধ্য দিয়ে মানবজাতির কল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে পারে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম ছাড়াও গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে এর মত বা এর চেয়ে উন্নতমানের কোনো বাক্য কেউ দেখাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কারন এটা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন। আর আল্লাহর কথা সাথে কোন মতাদর্শের তুলনা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।

পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল–

১। ব্যক্তিগত মালিকানা

২। শ্রমের পণ্যকরণ (Commodification of Labour)

৩। উদ্বৃত মুনাফা লাভ

৪। উদ্বৃত মুনাফা বিনিয়োগ

৫। মুনাফা লাভের প্রতিযোগিতা

৬। সঞ্চয়কৃত পুঁজি বিনিয়োগ

ইসলাম পুঁজিবাদের ব্যবস্থার ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী এমনকি মার্ক্সবাদী ব্যবস্থার ব্যক্তিগত মালিকনার উচ্ছেদেরও বিরোধী । আল্লাহ্ পাক সূরা বাকারায় মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেন-

الَّذينَ يُؤمِنونَ بِالغَيبِ وَيُقيمونَ الصَّلاةَ وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقونَ

অর্থঃ "যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে ।" – (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ৩)

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أَنفِقوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبتُم وَمِمّا أَخرَجنا لَكُم مِنَ الأَرضِ ۖ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقونَ وَلَستُم بِآخِذيهِ إِلّا أَن تُغمِضوا فيهِ ۚ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَميد

অর্থঃ "তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর ।" – (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২৬৭)

এর মানে ব্যক্তি যা উপার্জন করে তার চূড়ান্ত মালিক আল্লাহ্, ব্যক্তি হল সাময়িক শর্তযুক্ত মালিক । ব্যক্তি এক্ষেত্রে সমস্ত সম্পদ বা উপার্জন আত্মভোগেও ব্যয় করতে পারে, আবার আল্লাহ্র নির্দেশে ব্যয়ও করতে পারে। উপার্জন কোনো কাজে ব্যয় করবে তা নির্ভর করে তার বিশ্বাসগত দিকের উপর। ব্যক্তি যদি চূড়ান্ত মালিক হিসেবে আল্লাহ্কে মেনে নেয় তখন নিজের প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকী অংশ জনকল্যাণে ব্যয় করবে।

যারা জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে না কুরআন তাদেরকে দ্বীন অস্বীকারকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। সূরা মাউনে বলা হয়েছে–

اَرَءَيۡتَ الَّذِیۡ یُکَذِّبُ بِالدِّیۡنِ ؕ﴿۱﴾ فَذٰلِکَ الَّذِیۡ یَدُعُّ الۡیَتِیۡمَ ۙ﴿۲﴾ وَ لَا یَحُضُّ عَلٰی طَعَامِ الۡمِسۡکِیۡنِ ؕ﴿۳﴾

অর্থঃ "তুমি কি তাকে দেখেছো , যে দ্বীনকে অস্বীকার করে ? সে তো সেই যে এতিমকে তাড়িয়ে দেয়, অভাবগ্রস্থকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।" – (সূরা মাউন, আয়াতঃ ১, ২ ৩)

ইসলাম দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য কোনো কোমল সুরের ব্যবহার করে নি। ইসলাম মুমিনদের এই নির্দেশ প্রদান করে যে, ‘উপার্জিত সম্পদের মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর। এর মানে অভাবী মানুষের সাহায্য কোনো করুণার বিষয় নয়। এ হলো দায়িত্ব, স্পষ্ট সামাজিক দায়িত্ব। এ হল খোদাপ্রেমিকদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ, যে নির্দেশ বাস্তবায়নে ব্যক্তি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে এমনকি সামিষ্টকভাবে তৎপর হতে পারে।

পুঁজিবাদে শ্রম শোষণ যেমন সমর্থিত তেমনি শোষিত উদ্ধৃত মূল্য বিনিয়োগ করে পুঁজির আকার বড় করতে প্রচেষ্টা চালায়। ইসলামে শ্রম শোষণ শুধু নিষিদ্ধই নয়, ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়ে অভাবী বঞ্চিতদের জন্য সম্পদ বণ্টনের দায়িত্ব প্রদান করে। এ কারণে ইসলাম যাকাত ব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ জারি করেছে, যাতে করে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমে যায়। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন অসমতা হ্রাসের উপায় হিসেবে উল্লেখ করেন যে,ধনীর সম্পদের এক অংশ যদি দরিদ্র মানুষের মধ্যে বণ্টন করা যায়,তবে অসমতা হ্রাস পাবে। ইসলাম বহু আগেই অসমতা হ্রাসের এ বিধানকে যাকাত নামে কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে। পুঁজিবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। পুঁজিবাদীরা অধিক মুনাফা লাভের আশায় পুঁজি গঠনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। পুঁজি গঠনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে তারা সঞ্চয় প্রকল্প গ্রহণ করে। অতি বেশি সঞ্চয়মুখী হয় অধিক মাত্রায় বিনিয়োগের জন্য। এ অবস্থায় কৃপণতা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়। কৃপণতার কারণে স্বাভাবিক ব্যয়, আত্মীয়স্বজনের প্রতি দায়িত্ব, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, অভাবী ও বঞ্চিতদের প্রতি যে স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ– তা হারিয়ে পুঁজিপতিরা নিরন্তর চালিয়ে যায় মুনাফা লাভের অবিশ্রান্ত প্রতিযোগিতা। কুরআন সে প্রতিযোগিতাকে এভাবে তুলে ধরে–

اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰی زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ لَتَرَوُنَّ الۡجَحِیۡمَ ۙ﴿۶﴾

অর্থঃ “প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও,... তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই।” – (সূরা তাকাছুর, আয়াতঃ ১, ২, ৬)

এভাবেই প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে পুঁজিপতিরা যে সঞ্চয়ের সংস্কৃতি চালু রাখে তার ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য হল –

وَیۡلٌ لِّکُلِّ هُمَزَۃٍ لُّمَزَۃِ ۙ﴿۱﴾ الَّذِیۡ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۙ﴿۲﴾ یَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ ۚ﴿۳﴾

অর্থঃ দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী। যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে। সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করবে।– (সূরা হুমাযা, আয়াত ১, ২, ৩)

উপরোক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলাম বহু আগেই পুঁজিবাদ এর বিরোধিতা করে এসেছে। যখন কুরআন নাজিল হয়েছে তখন সমাজে বিকশিত পুঁজিবাদ না থাকলেও পুঁজিবাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর বিরোধিতা করা হয়েছে কুরআনে। কেননা ইসলাম নীতিগত ও আদর্শিকভাবে সেকুলারিজমের বিরোধী। 'পুঁজিবাদ' সেকুলারিজম থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বরং সেকুলারিজমের বিকাশের সাথে সাথে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে। সেকুলারিজম হল ইহজাগতিকতা। 'পুঁজিবাদ' ইহজাগতিকতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যই হল এই জগতেই ব্যক্তিগত পুঁজির পাহাড় বানাতে হবে, এ জগৎ হল সুখ সমৃদ্ধির সমস্ত আধার। সে কারণে পুঁজিবাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা ইসলাম মনে করে মানুষের জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থান হল পরকাল। পরকাল হল সুখ সমৃদ্ধির কেন্দ্র । ইসলাম পার্থিব জীবনকে ভোগ বিলাস বা সুখ-সমৃদ্ধির কেন্দ্র মনে করে না- যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মনে করা হয়। ইসলামে পার্থিব জীবন হল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জীবন, এ জীবন নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। এ জীবন হল মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োজিত থাকার জন্য। এ কারণে কুরআন বিভিন্নভাবে পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থেকে সৎকর্মের প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগের কথা ব্যক্ত করেছে।

উপসংহার

এমনটা হতেই পারে না যে, আল্লাহ্ ﷻ তাঁর দ্বীন দিয়েছেন, অথচ সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি বলে দেননি। আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

অর্থঃ তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এটাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।– (সূরা ফাতাহ, আয়াতঃ ২৮)

সুতরাং ইসলামের আগমন হয়েছে দুনিয়াতে কর্তৃত্ব করার জন্য । এই দ্বীন এজন্য আসেনি যে, তা অন্যের করুণার পাত্র হয়ে থাকবে । ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মুস্তাহাব কোন বিষয় নয় যে, করলে সওয়াব, না করলেও কোন গুনাহ নেই । বরং এটা তো এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর জন্য রাসূল ﷺ -এর জানাজা ও দাফন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছিলো।

আমরা কি আল্লাহ্‌র এই দ্বীনকে **দার-উন-নদোয়ার** ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিবো, যার জন্য রাসূল ﷺ নিজের জীবনকে বাজি রেখেছেন, পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে পায়ের সাথে জুতা পর্যন্ত আটকে গিয়েছিলো, খন্দকে পেটে পাথর বেঁধেছেন, **শিয়াবে-আবি-তালিবে** বন্দী হয়ে সাথীদের নিয়ে গাছের পাতা পর্যন্ত খেয়েছেন, উহুদে মাথায় প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, দান্দান মোবারক শহিদ হয়েছে?

আমাদের জীবন কি রাসূল ﷺ -এর জীবনের চেয়ে বেশি দামী হয়ে গেলো ?!

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত,ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।– (বুখারী ও মুসলিম)

আর এই প্রস্তাবনা নতুন কিছু নয় যে, তারা আপনাদেরকে আপোসের দিকে আহ্বান করা হবে । এর মাঝে যত সম্ভবনা-ই দেখা যাক না কেন– এটা আল্লাহ তায়লার পদ্ধতি নয় । আর এটা শুধুই মরীচিকা, যাকে আপনি পানি ভেবে বছরের পর বছর এর পিছনে ছুটতে থাকবেন, আর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হতে থাকবেন ।

এক নাপাকির মাধ্যমে যেমন আরেক পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়, তেমনি গণতন্ত্রের মাধ্যমেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় । আর এই সেক্যুলার ব্যবস্থার পরিবর্তন শুধু ভোটের মাধ্যমে সম্ভব না । মিশর ও আলজেরিয়ার ইতিহাস তো আপনাদের সামনে!

যারা আল্লাহর উপর বার্ধক্যের অপবাদ আরোপ করেছে বা মনে করছে যে, আল্লাহর ক্ষমতা এই যুগে চলে না, তাদের জন্যও আমার কোন কথা নয় । যারা আল্লাহর ক্ষমতার উপর পূর্ণ ইয়াকীন রাখেন, তাদের জন্য আমার উপদেশ হলো– আল্লাহ্ ﷻ নমরুদকে মশা দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন, আর আব্রাহাকে পাখি দিয়ে শেষ করেছেন ।

তারা আমাদেরকে জিম্মিদের মত কিছু ব্যক্তিগত আমল করার সুযোগ দিয়েছে, আর একে আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা বলছি! এটা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট মিথ্যাচার । তারা কেন আমাদের স্বাধীনতা দিবে! জমিন তো আল্লাহ্‌র । আর মুসলিমেরা আল্লাহর জমিন থাকার একমাত্র হকদার, কেননা তারাই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে । গযওয়ায়ে মুতার কথা স্মরণ করুন, যখন কাফিরদের সংখ্যাধিক্য দেখে কেউ কেউ রাসূল ﷺ -এর নিকট পত্র লেখার কথা বললেন এই পরামর্শ চেয়ে যে, কাফিরদের মোকাবিলা করা হবে, নাকি মুসলিমেরা পিছু হটবেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা রাঃ বলেছিলেন যা বলেছিলেন তার সারমর্ম ছিলো এরূপ–

"ওহে জনমন্ড়লী!এখন তোমরা শত্রুদের মুখোমুখি হতে পছন্দ করছো না! অথচ তোমরা সবাই শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়েছ।আমরা সংখ্যা দিয়ে যুদ্ধ করব না, আমরা লড়বো দ্বীনের বলে বলীয়ান হয়ে। যে দ্বীন দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সম্মানীত করেছেন। আর তোমাদের সামনে দুটি কল্যাণের পাথর রয়েছে, একটি- হয় বিজয়ী হবো নতুবা শাহাদাত লাভ করবো।"

তাই আপনারাও চিন্তা করুন । এই দুনিয়ার প্রতি সেই অনুরাগী হতে পারে যে, যার আখেরাতের উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। তাই আল্লাহ্ ﷻ বলেন–

فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।– (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৭৪)

যারা বলছে, এই যুগে ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তাদের জন্য রাসূল ﷺ -এর এই হাদিসই যথেষ্ট–

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ

আমার উম্মাতের একটি জামা'আত আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা তখনও লোকের উপর বিজয়ী থাকবে । – (সহিহুল জামে)

আল্লাহ্ আমদেরকে এসব কুফরি ও ঈমান-বিধ্বংসী তন্ত্র-মন্ত্র থেকে হিফাজত করুন এবং দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি, দাওয়াত, হিজরত ও জিহাদের উপর আমল করার তাওফীক দান করে । আমীন, ইয়া রাব্বাল আ'লামীন !

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

তথ্য সূত্র

১. গণতন্ত্রঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ– ড. আহমদ আলী

২. গণতন্ত্র নয়, পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব– মাওলানা আব্দুর রহীম

৩. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শুরায়ী নিজাম– মাওলানা আব্দুর রহীম

৪. আর রাহিখুল মাখতুম– আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)

৫. গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রবন্ধ– মুফতি মনসুরুল হক

৬. তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন– মুফতি শফি রহঃ